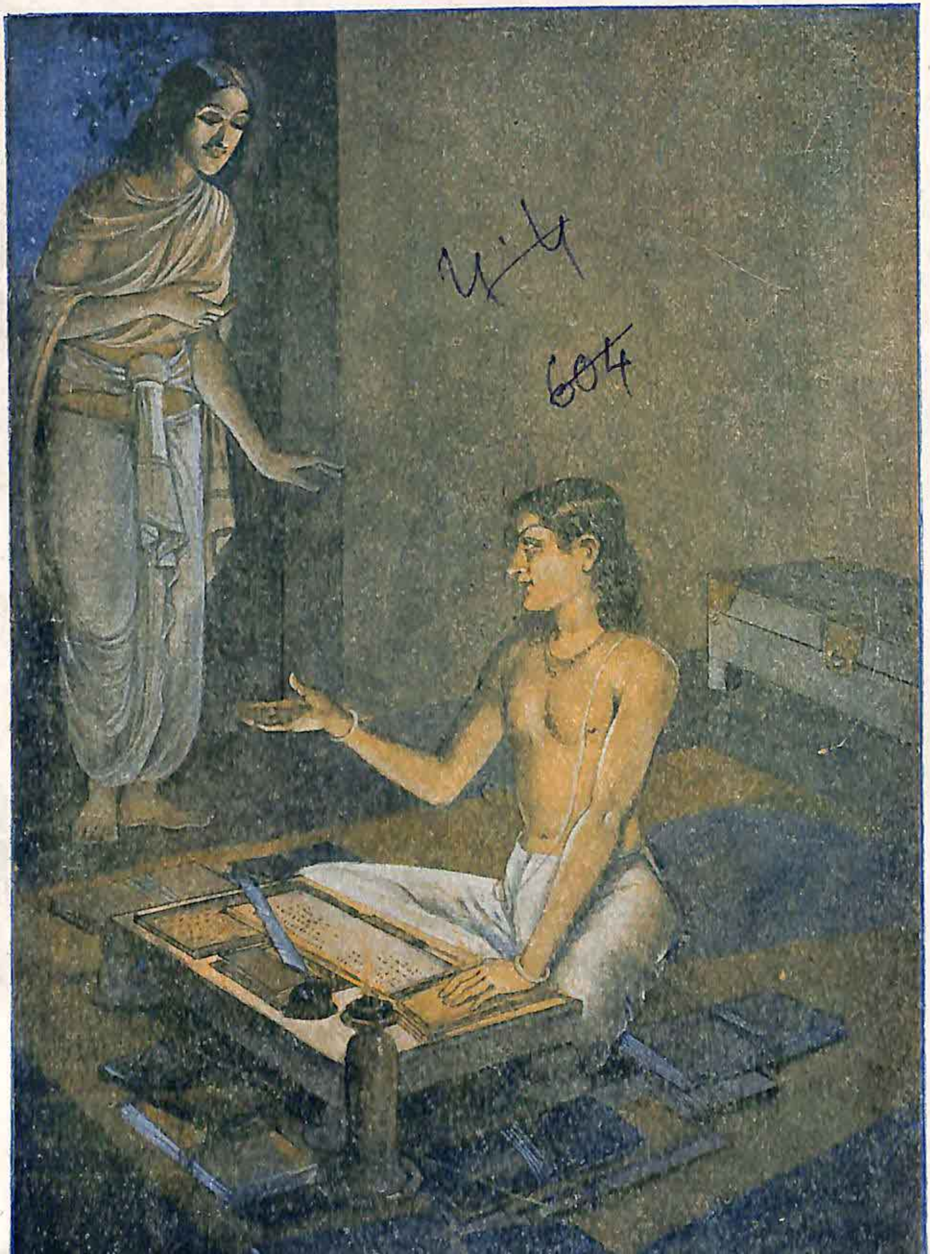
কালিদাস কাহিনী



জনশিক্ষা গ্রন্থমালা—১৭ নম্বর গ্রন্থ

কালিদাস—কাহিনী



মহাভারতীয় গল্প, পুরাণের গল্প, সাহিত্যে বাঙ্গালী, ধর্মে বাঙ্গালী,
দেবীযুদ্ধের গল্প প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

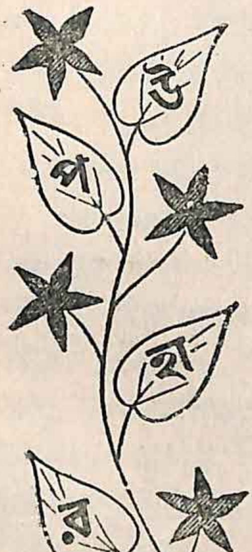
KALIDAS KAHINI
CODE NO. 9-69-053

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

সেপ্টেম্বর
১৯৮৭
৬

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৪·০০


উ
প
হা
র

কালিদাস—

কালিদাস ছিলেন মহাকবি। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়—তাঁর জীবনকাহিনী-সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত প্রামাণিকভাবে কোন কিছুই জানবার উপায় নেই। লোকপ্রসিদ্ধি—কালিদাস উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন।

কিন্তু এই বিক্রমাদিত্য ভারত-ইতিহাসের কোন্ বিক্রমাদিত্য, এবং কোন্ কালে তিনি বর্তমান ছিলেন, তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। তবে লোকপরম্পরায় কালিদাসের বিদ্যালাভের, পাণ্ডিত্যের এবং ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কিছু কাহিনী আজও বেঁচে আছে। এগুলি সত্যি কি মিথ্যা—আজ নিশ্চিতভাবে বলবার কোন উপায় নেই। তবু এ কাহিনীগুলিকেই কালিদাসের জীবন-কাহিনী বলে ভেবে নেওয়া ছাড়া আর পথই বা কি?

অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভার অধিকারী মহাকবি কালিদাসের কাব্যগুলি সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবাসীর সাহিত্যরসপিপাসা মিটাতে যথেষ্ট সাহায্য ক'রে আসছে। তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত', 'ঋতুসংহার', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা', 'বিক্রমোর্বশী' এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্র'—সবগুলিই প্রায় সমভাবেই আদৃত হয়ে আস্ছে। নলোদয়, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গারাষ্টক, শৃঙ্গারতিলক কাব্যও কালিদাসের নামে প্রচলিত। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে এই কাব্যগুলি অপর কোন কালিদাস-কর্তৃক লিখিত হয়েছে।

আকস্মিকভাবে দৈবপ্রভাবে একদিনেই কালিদাস কবিত্বশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন বলে প্রবাদ প্রচলিত থাক্‌লেও তা বাস্তব সত্য বলে মনে হয় না। তাঁর সহজাত কবিত্বশক্তির সঙ্গে সুদীর্ঘদিনের সাধনা যুক্ত হয়েছে বলেই বোঝা যায়।

কালিদাস যে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি এবিষয়ে সকলেই একমত। বিদেশী কবি ও মনীষীরাও কালিদাসের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। সত্যি, কালিদাসের রচনাগুণের তুলনা নেই। এমন সহজ-সুন্দর রচনা তো সহজে আসে নি, অনেক শ্রম আর অনুশীলন নিশ্চয়ই আছে এর পিছনে। প্রতিভার সঙ্গে সাধনার মণিকাঞ্চনযোগেই তা সম্ভব হয়েছে। কালিদাসের গল্প বলার ভঙ্গী, বর্ণনা, উপমাপ্রয়োগ, অল্পের মধ্যে অনেক কথা বলবার আশ্চর্য নৈপুণ্য—সমস্ত কবির কাছেই প্রেরণা। কবিরাও কালিদাসের স্তুতিতে পঞ্চমুখ। বাণভট্ট বলেছেন,

মধুর ভারে নুয়ে পড়া ফুলে যেমন পরিতৃপ্তি
কালিদাসের রচনাতেও তাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও কালিদাসের প্রভাব ও প্রসঙ্গ অনবদ্যরূপ পেয়েছে।

আগেকার দিনে অসাধারণ নৈপুণ্যের পিছনে দৈবের প্রভাব কল্পনা করা হত। কালিদাসের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে। ঐ অসাধারণ নৈপুণ্যকে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী করে তোলবার প্রবণতাও তখন ছিল। কালিদাসকেও তাই প্রতিযোগিতার আসরে দেখতে পাই কিংবদন্তীগুলিতে। আর কিংবদন্তীগুলো পাত্রবদল করে, অর্থাৎ একজন সম্পর্কে যা প্রচলিত, কোনো সময়ে তা অন্যের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়ে পড়ে। কালিদাসের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে।

গল্পগুলোতে কালিদাসের জীবনী-গত ঐতিহাসিকতা বা সত্যতা না থাকলেও গল্পরচয়িতাদের মনের পরিচয়, এবং পুরনো দিনে কিছু আচার ব্যবহারের ছবি তাতে ফুটবে। সেইটুকুই বা কম লাভ কী?

—*—

—ঃ*ঃ—

[১]

অনেকদিন আগেকার কথা। শারদানন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। বিদ্যোত্তমা নামে তাঁর এক কন্যা ছিল। কন্যা ছিলেন খুব রূপবতী, তার উপর বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে তাঁর তুলনা ছিল না।

বিদ্যোত্তমার পণ ছিল, যিনি পাণ্ডিত্যে তাঁকে পরাজিত করতে পারবেন, তাঁরি গলায় তিনি বরমাল্য দেবেন।

এ খবর পেয়ে বহু যুবক এবং বৃদ্ধ পণ্ডিত বিদ্যোত্তমার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে আসতেন; কিন্তু তাঁর কাছে তর্কে পরাজিত হ'য়ে লজ্জায়, অপমানে পালিয়ে যেতেন।

একবার একদল পণ্ডিত এইভাবে অপমানিত হ'য়ে সবাই মিলে যুক্তি করলেন—কোন মহামূর্খের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। এই ভেবে তাঁরা এক মূর্খ লোক খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন।

একদিন তাঁরা দেখেন, এক যুবক একটি গাছের উঁচু ডালে বসে সেই ডালেরই গোড়া কাটছে। তাই দেখে পণ্ডিতেরা ভাবলেন—এর চেয়ে মূর্খ আর কেউ হ'তে পারে না! এই ভেবে তাঁরা তাকে ডেকে নামালেন।

যুবকটির চেহারা ছিল বেশ ভালো। পণ্ডিতরা ভাবলেন, একে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিলে ভালোই দেখাবে। তাই জিজ্ঞেস করলেন—বিয়ে করবে?

বিয়ের নাম শুনে যুবক ভারী খুশী। সে জবাব দিল—হ্যাঁ করব।

পণ্ডিতরা বললেন—বেশ তাহ'লে চলো আমাদের সঙ্গে।

মূর্খ আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে চললো পণ্ডিতদের সঙ্গে। পণ্ডিতেরা তাকে নতুন কাপড় পরিয়ে, গলায় নতুন পৈতে দিয়ে, গঙ্গামাটি দিয়ে কপালে ফোঁটা তিলক এঁকে, হাতে এক নস্যের কৌটা দিয়ে নিয়ে চললেন রাজসভায়।

পথে তাকে শিখিয়ে দেওয়া হ'লো—রাজসভায় সে যেন কোন কথা না বলে। কেবল মাত্র আকার-ইঙ্গিতে যা খুশি দেখাতে পারবে। তবেই রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হ'তে পারে।

সকলে রাজসভায় গিয়ে পৌঁছলেন। নবীন যুবকটিকে দেখে সকলে এর পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। পণ্ডিতেরা বললেন : 'ইনি একজন মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর। নির্জনে বসে শুধুই শাস্ত্র-চিন্তা করেন। ইনি মৌনী এবং ব্রহ্মচারী—আকারে-ইঙ্গিতে প্রশ্নের জবাব দেবেন।'

যুবকটি এতবড় পণ্ডিত, বিদ্যোত্তমা তা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি নানারূপ সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন। তখন সেই মূর্খ প্রথম আটটি আঙুল দেখালো, তারপর আঙুলগুলি বাঁকালো। তারপর একবার পণ্ডিতদের দিকে এবং পরে বিদ্যোত্তমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

রাজকন্যা এর অর্থ বুঝতে না পেরে পণ্ডিতদের বললেন : 'এ সংকেতে তো কিছুই বোঝা গেলো না।'

পরাজিত পণ্ডিতেরা তখন বললেন :

'আপনি তাহ'লে পরাজিত হলেন। কারণ সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে অভিনয় অন্যতম বিদ্যা—আপনি সে বিদ্যা জানেন না। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে সংকেত করেছেন, তার অর্থ হ'লো—

জ্ঞানোপদেশের জন্যে পণ্ডিতগণ যেন আপনাকে অষ্টাবক্র-বন্দি-সংবাদ বলেন।'

বিদ্যোত্তমা তখন নিতান্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে অষ্টাবক্র-বন্দি-সংবাদ জানতে চাইলেন।

একজন পণ্ডিত তখন বললেন ঃ

* * * *

পূর্বে উদ্দালক নামে এক মুনি ছিলেন। কহোড় নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে বেদাদি অধ্যয়ন করতেন। কালক্রমে কহোড় অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করলে উদ্দালক তাঁর কন্যা সুজাতাকে কহোড়ের হস্তে অর্পণ করলেন।

যথাকালে সুজাতা গর্ভবতী হলেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাঁর সন্তান গর্ভে থেকেই প্রচুর জ্ঞান আহরণ করলো। কহোড় স্বীয় শিষ্যদের যে সব শাস্ত্রব্যাখ্যা শোনাতেন, মাতৃগর্ভে থেকেই তাঁর সন্তান সেই শাস্ত্রও শিখে ফেললেন।

কহোড়মুনি সারারাত জেগে বেদ অধ্যয়ন করতেন। একদিন তিনি সকালবেলা শিষ্যদের পাঠ দিচ্ছেন, এমন সময় তাঁর উচ্চারণে এক জায়গায় ভুল হ'য়ে গেলো।

মাতৃগর্ভে থেকেই তাঁর সন্তান পিতাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন ঃ

'আপনি রাত জেগে পড়াশোনা করেন বলে আলস্য, তন্দ্রা এবং জড়তা আপনাকে আক্রমণ করেছে—আপনি তাই ভুল উচ্চারণ করলেন।'

নিজের অজাত সন্তানের কাছে শিষ্যদের সামনে এইভাবে অপদস্থ হ'য়ে কহোড়মুনি পুত্রকে অভিশাপ দিলেন ঃ

এই সংবাদ শুনে অষ্টাবক্র তাঁর প্রতিশোধ নেবার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন।

সেই উদ্দেশ্যে মাতুল শ্বেতকেতুকে সঙ্গে নিয়ে মিথিলা-অভিমুখে যাত্রা করলেন।

যথাসময়ে তাঁরা মিথিলায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। বিরাট রাজপ্রাসাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দ্বারী এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। বললো:

'শিশুদের এই সভায় প্রবেশ নিষেধ। একমাত্র জ্ঞানী, বিচক্ষণ, প্রবীণ পণ্ডিতেরাই সভায় প্রবেশ লাভ করতে পারেন।'

অষ্টাবক্র উত্তর করলেন:

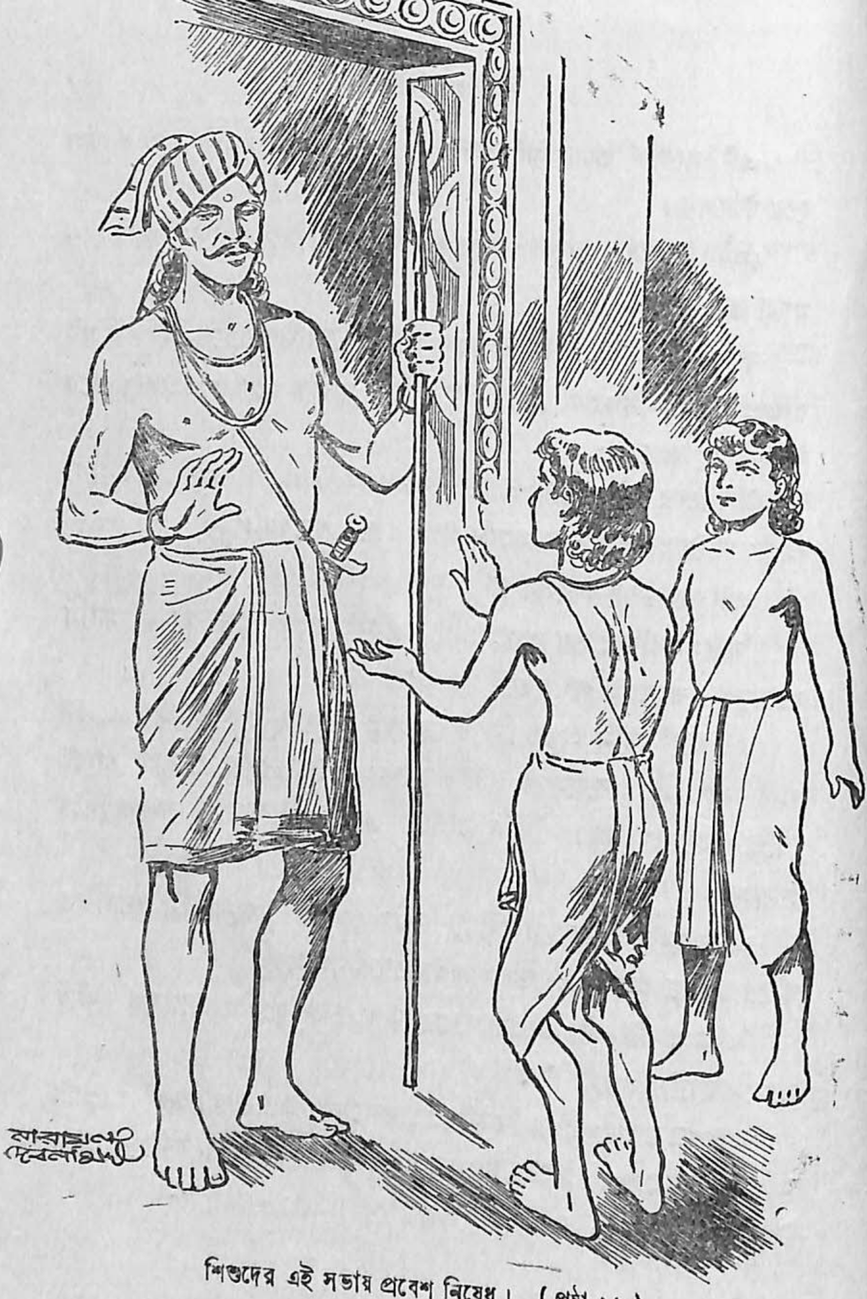
'বয়সেই মানুষ শুধু বৃদ্ধ হয় না, জ্ঞানেই প্রকৃত বৃদ্ধ হয়। আমি জ্ঞানবৃদ্ধ—আমাকে পথ ছেড়ে দাও।'

এই বলে তিনি অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে রাজার প্রশস্তিবাচক শ্লোক পাঠ করলেন। রাজসভা থেকে রাজা সেই শ্লোক শুনতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি এগিয়ে এসে অষ্টাবক্রকে সভায় নিয়ে গেলেন।

অষ্টাবক্র জানতে চাইলেন, বন্দী কে? তাঁকে তিনি পরাজিত ক'রে জলমগ্ন করবেন। তখন রাজা তাঁকে বললেন:

'আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর করতে পারলেই তোমাকে বন্দীর সামনে হাজির করবো।'

তারপর রাজা পরপর তিনটি প্রশ্ন করলেন, অষ্টাবক্র তিনটি প্রশ্নেরই অতি সন্তোষজনক উত্তর দিলেন। তখন রাজা তাঁকে বন্দীর সামনে উপস্থিত করলেন।



শিশুদের এই সভায় প্রবেশ নিষেধ। (পৃষ্ঠা ১১)

অষ্টাবক্রকে সম্মানের সহিত সোনার সিংহাসনে বসতে দেওয়া হ'লো। তিনি তাতে বসেই চোখ পাকিয়ে বন্দীকে বললেন ঃ

'বহু ব্রাহ্মণকে জলমগ্ন ক'রে যে পাপ করেছেন, আজ আপনাকে সেই পাপের প্রতিফল ভোগ করতে হবে। বলুন—কী প্রশ্ন আছে আপনার ?'

বারো বছরের এক কিশোর বালককে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বন্দীর সঙ্গে এরূপভাবে কথা বলতে দেখে সভাশুদ্ধ লোক ভয়ানক বিস্মিত হলেন।

অষ্টাবক্র ও বন্দীতে প্রশ্নোত্তর হ'তে লাগলো। দর্শকেরা পরম কৌতুকের সঙ্গে উপভোগ করতে লাগলেন। হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত বন্দী ঠেকে গেলেন। বালক অষ্টাবক্রের জয় ঘোষিত হ'লো।

এবার অষ্টাবক্র বললেন ঃ

'বন্দী এবার জলশায়ী হোন্—আমার পূর্বপুরুষগণ তৃপ্তি লাভ করুন।'

হেসে বললেন বন্দী ঃ

'জল থেকে আমার ভয় নেই, কারণ আমি জলাধিপতি বরুণের পুত্র। আর আমি যে সমস্ত মুনিঋষিদের জলমগ্ন করেছি, তাঁরা কেউ মৃত্যুবরণ করেননি। আমার পিতা যজ্ঞ করছেন, আমি ছল ক'রে তাঁদের সেই যজ্ঞশালায় পাঠিয়েছি। আজই সেই যজ্ঞ শেষ হবে, —তোমার পিতাকে সঙ্গে নিয়ে অপর সব মুনিরাও আজ ফিরে আসবেন।'

বন্দীর কথায় অষ্টাবক্র বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, তাকে বালক পেয়ে বন্দী ছলনা ক'রে ভুলাচ্ছেন। তাই অষ্টাবক্র জনক রাজাকে অনুরোধ ক'রে বললেন ঃ

'মহারাজ, বন্দী বালক পেয়ে আমাকে ভুলাচ্ছেন, আপনি ন্যায়ধর্মের অনুরোধে ওঁকে দড়িতে বেঁধে জলে ডুবিয়ে দিন।

কথা শুনে বন্দী হেসে উঠলেন :

'কষ্ট ক'রে আর আমাকে জলে ডুবিয়ে দিতে হবে না—আমি নিজের ইচ্ছাতেই জলের ভিতর যাচ্ছি।'

এই বলে বন্দী জলমগ্ন হলেন। মুহূর্তকাল পরেই আবার উঠে এলেন জল থেকে—তাঁর সঙ্গে এলেন কহোড় এবং অন্যান্য মুনিগণ।

কহোড় পুত্রের পরিচয় পেয়ে সানন্দে তাকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললেন নিজের বাড়ির দিকে।

পথে কহোড় পুত্রকে নদীতে স্নান করতে বললেন। স্নান করবার পর অষ্টাবক্রের দেহের বক্রতা দূর হয়ে গেলো।

* * * *

পণ্ডিত অষ্টাবক্র-বন্দি-সংবাদ শেষ করলেন। তারপর সেই পণ্ডিত বিদ্যোত্তমাকে বললেন :

'আপনি এই মৌনী পণ্ডিতকে বয়সে অল্প দেখেই এঁর পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলেন। তাই অষ্টাবক্রের কাহিনী দ্বারা ইনি ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে, বৃদ্ধ হলেই বুদ্ধিমান্ হয় না—সাধনাদ্বারা বালকও বিচক্ষণ পণ্ডিত হতে পারেন।'

বিদ্যোত্তমা এবার ভাবলেন, তিনিও সংকেতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। তখন রাজকন্যা মূর্খকে একটি আঙুল দেখালেন।

মূর্খ ভাবলো—কন্যা বুঝি তার এক চোখ কানা ক'রে দেবার জন্যে এক আঙুল দেখালেন। ভয়ে সেই মূর্খ তখন কন্যাকে দেখালো দুই আঙুল—কন্যার দুই চোখই সে কানা ক'রে দেবে।

পণ্ডিতেরা তখন জয়োল্লাস ক'রে উঠলেন। তাঁরা বললেন: 'বিদ্যোত্তমা একটি আঙুল দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, এই জগতের স্রষ্টা এক—অর্থাৎ পুরুষ। গুরুদেব তার জবাবে বলেছেন, না, জগতের স্রষ্টা হলেন দুই—পুরুষ ও প্রকৃতি। তাই গুরুদেব দুটি আঙুল দেখিয়েছেন।

এইভাবে নানাজনের চক্রান্তে বিদ্যোত্তমা পরাজয় স্বীকার করলেন! তখন সেই মূর্খের সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হ'লো।

এই মূর্খই পরবর্তীকালে জগৎপ্রসিদ্ধ মহাকবি কালিদাস।

[২]

মহাসমারোহে কালিদাসের সঙ্গে বিদ্যোত্তমার বিবাহ সম্পন্ন হল। বাসরে বসে আছেন দুজনে। বিদ্যোত্তমা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখনও কি আপনি মৌনী রইবেন?' কালিদাস তো নিজে থেকে আদৌ মৌনী থাকতে চান না, কথা বলতে পারলেই তো বেঁচে যান। কিন্তু হঠাৎ মৌনভঙ্গও তো করতে পারেন না। তিনি তাই বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাইলেন বিদ্যোত্তমার দিকে? বিদ্যোত্তমা সেই দৃষ্টির একটা অর্থ মনে মনে আঁচ করলেন। বললেন, বুঝেছি। আপনি নিজে থেকে কিছু বলতে চান না, কিন্তু আমি যদি কিছু জিজ্ঞেস করি তার জবাব দেবেন এই তো?' কালিদাস মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

হঠাৎ কী একটা ডেকে উঠল বাইরে। বিদ্যোত্তমা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ডাকল বলুন তো?' কালিদাস জবাব দিলেন, 'উষ্ট'। স্বামীর প্রথম কথা কানে গেল বিদ্যোত্তমার, কিন্তু তা মধুবর্ষণ না করে বিষবর্ষণ করল তার কানে। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবার বলুন তো কী ডাকছে?'

কালিদাস হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, 'উট্র'।

এবারে বিদ্যোত্তমা বুঝতে পারলেন পণ্ডিত বলে যিনি প্রতিপন্ন হয়েছিলেন আসলে তিনি মহামূর্খ।

কপালে করাঘাত করলেন বিদ্যোত্তমা—উষ্ট্র বলতে একবার যে 'র' লোপ করলেন, আর-একবার করলেন 'ষ' লোপ, তাকেই কিনা ঘটনাচক্রে আমি পতিরূপে বরণ করেছি?'

বিদ্যোত্তমার দুঃখ ক্রোধে পরিণত হল। কালিদাসকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, 'ধূর্ত আমি তোমার কী ক্ষতি করেছিলাম যে আমাকে প্রবঞ্চিত করলে। মূর্খ, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও।'

কালিদাস ভাবলেন, তার পত্নী সঙ্গত কারণেই ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বিদূষী পত্নী মূর্খ স্বামীকে সহ্য করবেন কেন? পত্নীর ধিক্কার সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ।

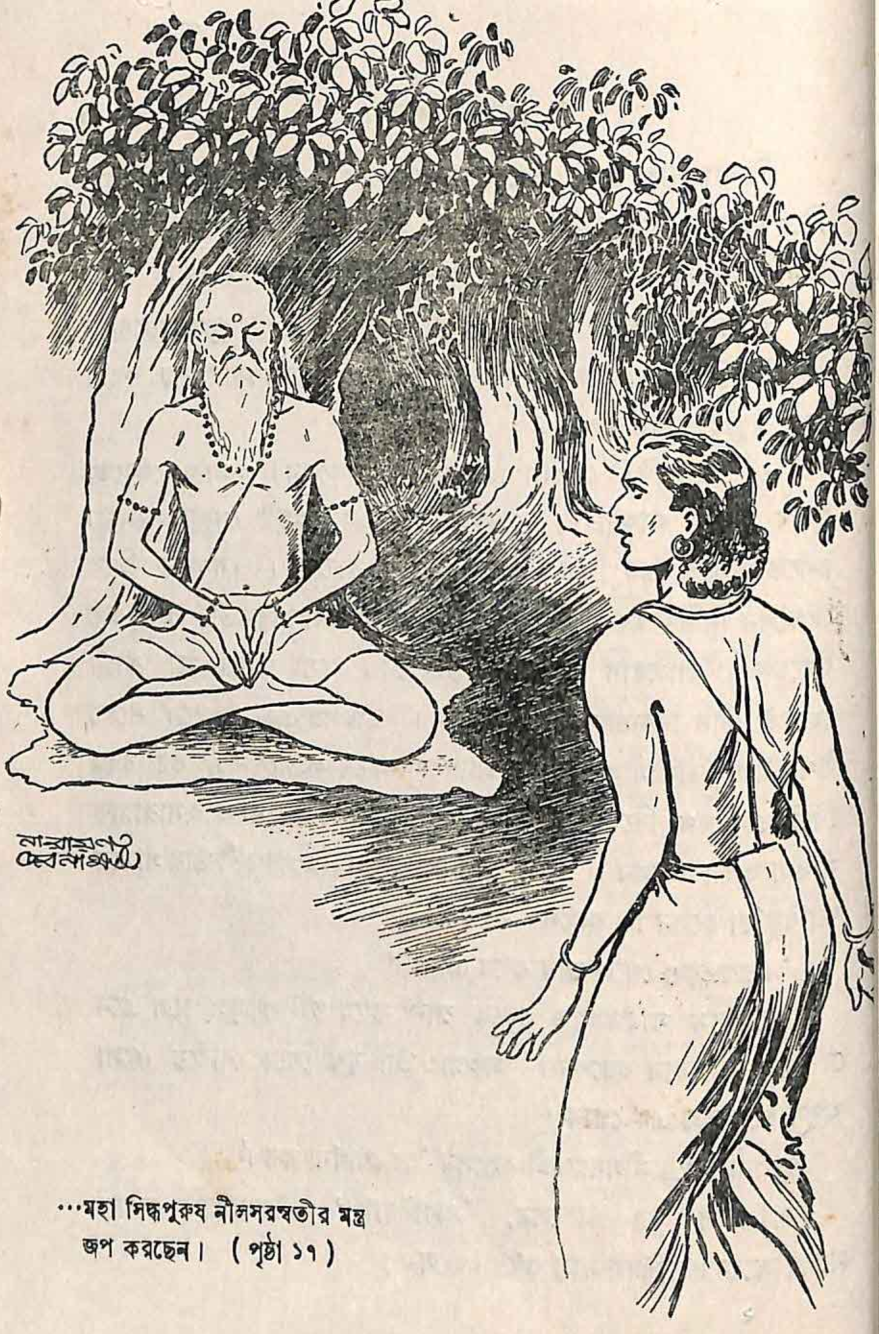
এই ভেবে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে তিনি আত্মহারা। কোথায় চলেছেন কিছুই খেয়াল নেই। চলতে চলতে এক গভীর বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন নিবিড় অন্ধকারে এক মহা সিদ্ধপুরুষ নীলসরস্বতীর মন্ত্র জপ করছেন। কালিদাস দাঁড়ালেন সেখানে। সেই সিদ্ধ মন্ত্র কানে যেতেই তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। তারপর এক শ্মশানে শবের উপর বসে তিনি নীলসরস্বতীর আরাধনা করতে লাগলেন। কত রকম বিভীষিকা দেখা দিলো তাঁর সামনে—কিন্তু তিনি ভয় না করে সারারাত সাধনা ক'রে চললেন। অবশেষে নিশাবসানে নীলসরস্বতী তাঁর সামনে আবির্ভূতা হলেন। বললেন:

'সারস্বতকুণ্ড থেকে স্নান ক'রে এসো।'

কালিদাস সারস্বতকুণ্ড থেকে স্নান ক'রে দুটি পদ্মফুল তুলে এনে দেবীর অঞ্জলি দান করলেন। অকস্মাৎ তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ এক শ্লোক।

সুপ্রসন্ন হ'য়ে নীলসরস্বতী বললেন 'বর প্রার্থনা কর।'

কালিদাস বর চাইলেন, 'মহাবিদ্যা!' নীলসরস্বতী তখন কালিদাসকে মহাবিদ্যা দান ক'রে বললেন:



…মহা সিদ্ধপুরুষ নীলসরস্বতীর মন্ত্র জপ করছেন। (পৃষ্ঠা ১৭)

'এখন থেকে আমি সর্বক্ষণ তোমার রসনায় বাস করবো। যখনি তুমি ইচ্ছা করবে, তখনি আমার এ রূপ তুমি দেখতে পাবে।'

তারপর কালিদাসের সর্বপ্রকার জড়তা দূর করবার উদ্দেশ্যে দেবী কালিদাসকে সারস্বতকুণ্ডের জল আনতে বললেন। পাতার ঠোঙায় ক'রে কালিদাস কুণ্ডের জল নিয়ে এলে দেবী তা' প্রসাদ ক'রে দিলেন। কালিদাস দেবীর প্রসাদ গ্রহণ ক'রে একটু অবশিষ্ট রেখে দিলেন পত্নীর জন্যে।

দেবীর প্রসাদ সবটুকু গ্রহণ না করার অপরাধে একবার কালিদাস দিগ্বিজয়ী হয়েও কর্ণাট-সম্রাট্-বনিতার নিকট অপমানিত হয়েছিলেন।

যাহোক্, কালিদাস দেবীকে প্রণাম ক'রে ফিরে এলেন। ফিরবার পথে প্রসাদের অবশিষ্ট অংশ ঘটকর্পর নামক এক কুমোরের ঘরে রেখে এলেন। তাকে এই বলে কালিদাস ভয় দেখালেন যে এতে বিষ আছে—কেউ যেন এটা না খায়।

এই বলে কালিদাস গেলেন রাজবাড়িতে তাঁর স্ত্রীর নিকটে।

বিদ্যোত্তমা স্বামীকে ভৎ'সনা করবার পর থেকেই মনোদুঃখে ঘরে খিল দিয়ে বসেছিলেন। কালিদাস দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললেন: 'অস্তি কশ্চিদ্বাগ্বিশেষঃ (বিশেষ কথা আছে)। দরজা খোল। দরজা খোল।'

বিদ্যোত্তমা মূর্খ স্বামীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা শুনে বিস্মিত হলেন। তবু মনের সন্দেহ ঘুচাবার জন্য বললেন: 'যে চারটি শব্দের সাহায্যে এই বাক্য রচনা করেছেন, এদের প্রত্যেকটি শব্দের সাহায্যে এক একটি বাক্য রচনা করুন—তবেই দরজা খুলবো।'



...দেবী তা' প্রসাদ ক'রে দিলেন। (পৃষ্ঠা ১৯)

তখন কালিদাস 'অস্তি', 'কশ্চিৎ', 'বাক্' এবং 'বিশেষঃ'—এই চারটি শব্দ আদিতে রেখে চারটি বাক্য রচনা ক'রে ফেললেন। তারপর বললেন ঃ 'এই নিয়ে আমি চারখানা কাব্য রচনা করবো।'

কাব্য ? এই তো মনে প্রাণে চেয়েছিলেন বিদ্যোত্তমা, শুধু পণ্ডিত নয়, তাঁর স্বামী হবেন কবি। আনন্দে অধীর হয়ে দুয়োর খুলে দিলেন বিদ্যোত্তমা। তাঁর সৌভাগ্যের দুয়োরই যেন খুলে গেল। ভিতরে এলেন কালিদাস। স্বামীর চরণে লুটিয়ে পড়লেন বিদ্যোত্তমা।

কালিদাস তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। 'অস্তি' 'কশ্চিৎ' আর 'বাক্' এই তিনটি শব্দ তিনটি উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন! 'কুমারসম্ভব' কাব্যের প্রথম শব্দ 'অস্তি'—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ ;

শ্লোকের প্রথম চরণের প্রথম শব্দটি 'অস্তি'।

'কশ্চিৎ' শব্দটি তিনি 'মেঘদূত' কাব্যের প্রথম শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন—

কশ্চিৎ কান্তবিরহগুণা স্বাধিকারাপ্রমত্তঃ।

'বাক্' কথাটি আছে রঘুবংশ কাব্যের প্রথম শ্লোকে—

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতরং বন্দে পার্বতপরমেশ্বরৌ

'বিশেষঃ' দিয়ে শুরু এমন কোনো কাব্য অবশ্য কালিদাসের নামে পাওয়া যায় নি। আসলে বাগ্‌বিশেষঃ কথাটির মধ্যে 'বাক্ কথাটিই প্রধান। প্রয়োগের দিক্ দেখে 'বাক্' বা বাক্‌বিশেষঃ প্রায় একই।

আমরা কল্পনা করতে পারি কালিদাস এইসব কাব্য রচনার সময় পড়ে পড়ে শোনাতেন বিদ্যোত্তমাকে।

ওদিকে কালিদাস ঘটকর্পরের ঘরে যে সরস্বতীর প্রসাদী জলের অংশ রেখেছিলেন, সেটা ও-ভাবেই ছিল! একদিন আত্মীয়দের সঙ্গে কলহ ক'রে বিষপানে আত্মহত্যা করবার জন্য ঘটকর্পর বিষ মনে ক'রে সেই জল খেয়ে ফেললেন। তার ফল হ'লো বিপরীত। ঘটকর্পর মরলেন না। তিনিও পরে কালিদাসের মতই পণ্ডিত এবং কবি হ'য়ে উঠেছিলেন।

[৩]

এর পর কয়েক বছর কেটে গেল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ছিলেন তখন উজ্জয়িনীর রাজা। তাঁর রাজসভায় শিল্পী, কবি ও পণ্ডিতদের যেমন সমাবেশ হয়েছিল, তেমনটি আর এর আগে ভারতের কোনো রাজসভাতেই হয়নি। কবি কালিদাস এই রাজসভায় স্থান পেলেন রাজকবি হিসাবে। তিনি হলেন নবরত্নের শ্রেষ্ঠ রত্ন, রাজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র।

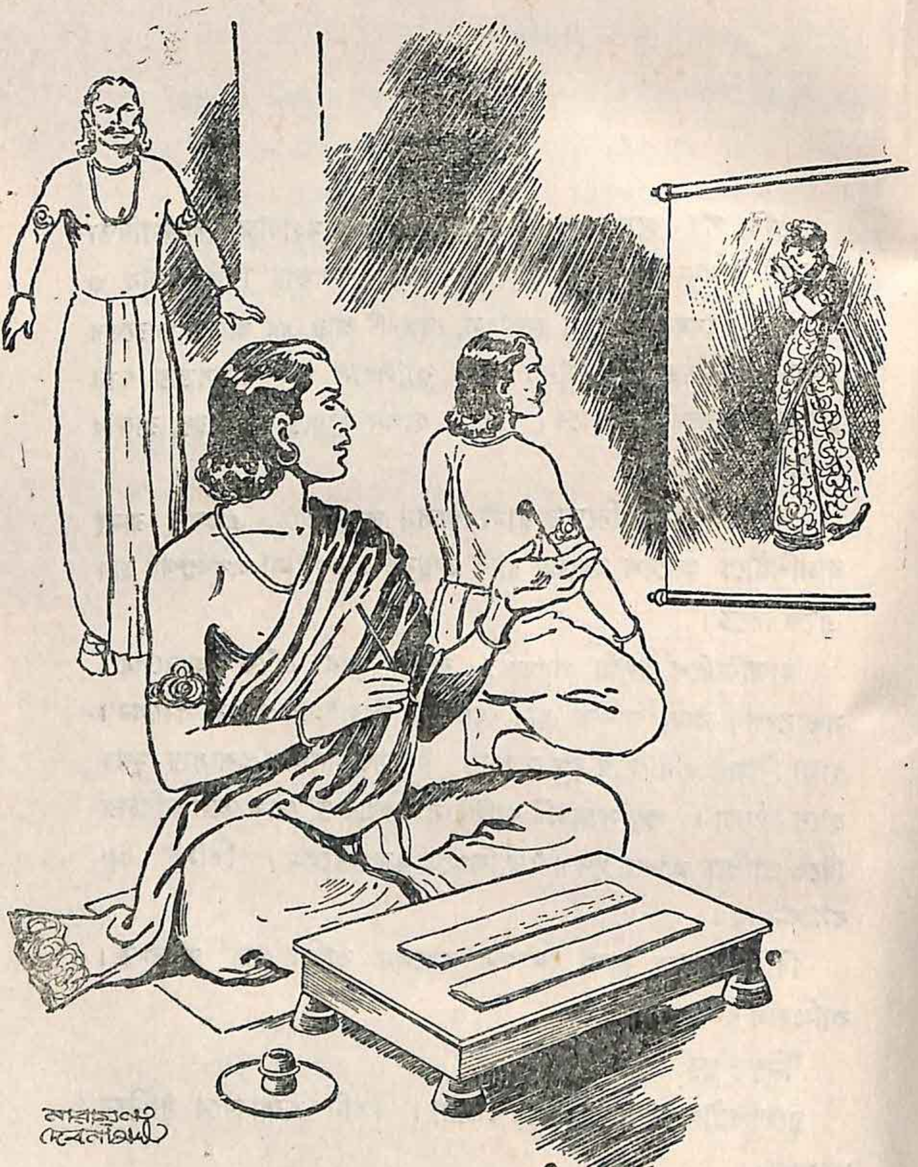
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রানী ছিলেন ভানুমতী। একবার রাজা রাজশিল্পীকে আদেশ করলেন রানী ভানুমতীর একখানা অপূর্বসুন্দর ছবি এঁকে দিতে।

রাজনির্দেশে শিল্পী পরমযত্নে রানীর ছবি এঁকে আনলেন। সভাসদ্গণ যাঁরা রানীর ছবি দেখলেন, তাঁরাই খুব প্রশংসা করলেন। রাজা নিজেও ছবি দেখে মুগ্ধ হলেন। রাজসভা শিল্পীর প্রশংসায় মুখর হ'য়ে উঠলো। শুধু সভাকবি কালিদাস একবার ছ' চোখ তুলে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আবার মুখ গুঁজে লিখতে শুরু করলেন। তিনিই কিছু বললেন না।

বিস্মিত হ'য়ে রাজা জিজ্ঞেস করলেন কালিদাসের অভিমত। কালিদাস বললেন ঃ

'নিখুঁত হয়নি এ ছবি।'

রাজশিল্পীর মুখ মলিন হ'য়ে গেলো। তিনি অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইলেন।



কালিদাস বললেন : 'নিখুঁত হয়নি এ ছবি।' (পৃষ্ঠ ২৩)

কালিদাস যখন হাত নেড়ে কথা বলছিলেন, তখন তাঁর হাতের কলম থেকে এক ফোঁটা কালি ছিট্‌কে পড়েছিলো ছবিটার মধ্যে। কালিদাস তখন বলে উঠলেন :

'হ্যাঁ, এবার নিখুঁত হ'লো তোমার আঁকা ছবি, রাজশিল্পী।'

রানী ভানুমতীর দেহে ছিল একটা তিল—রাজশিল্পী সেই তিলের সন্ধান জানতেন না বলেই ছবিতে সে তিল আঁকতে পারেননি। কালিদাসের কলম থেকে ছিট্‌কে-পড়া কালিতে সেই তিলের সৃষ্টি হয়েছিলো।

রাজা প্রথমে অবাক হয়েছিলেন, পরে ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ভাবলেন : কালিদাস কোন দিন প্রকাশ্যে ভানুমতীকে দেখেননি, তবে কি ক'রে জানলেন সেই তিলের খবর!

ক্রুদ্ধ হ'য়ে রাজা মন্ত্রীকে আদেশ দিলেন—কালিদাস যেন কোনদিন আর রাজার সামনে না পড়েন। তিনি আর তাঁর মুখদর্শন করবেন না।

মন্ত্রী মহা বিপদে পড়লেন। ভাবলেন : কালিদাস এমন গুণী ব্যক্তি, তাঁকে হত্যা করাও সঙ্গত নয়, আবার তাড়িয়ে দেওয়াও অনুচিত। একসময় রাজার রাগ প'ড়ে যেতে পারে, তখন হয়তো তিনি কালিদাসের জন্য দুঃখ করতে পারেন।

এই ভেবে মন্ত্রী কালিদাসকে লুকিয়ে রাখলেন নিজের অন্তঃপুরে। কালিদাস তখন থেকে নারীবেশেই মন্ত্রীর অন্তঃপুরে বাস করতে লাগলেন।

এদিকে এক ঘটনা ঘটলো।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পুত্র রাজকুমার বীরকেশরী। বীরকেশরী একদিন বেরিয়েছেন মৃগয়ায়। সারা অরণ্যে ঘুরে ফিরে রাজকুমার অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে এক পুকুরের তীরে বড় একটা গাছে ঘোড়া বেঁধে নিজেও বিশ্রাম করতে বসলেন। সঙ্গীরা তখনও এসে পৌছায়নি বলে রাজকুমার উঠতেও পারছেন না।

এদিকে বেলা প'ড়ে এলো। সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। এমন সময় নিবিড় মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেলো। প্রবলবেগে বায়ু বইতে লাগলো। ভয় পেয়ে ঘোড়াও ছুটে পালালো।

রাজকুমার কি করবেন ভেবে পেলেন না। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই বিদ্যুতের আলোকে তিনি দেখতে পেলেন—তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে বিরাটাকার এক বাঘ।

ভয় পেয়ে রাজকুমার দৌড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন এক গাছে। কিন্তু গাছের উপর উঠেও চমকে উঠলেন। দেখলেন গাছের ডালে শুয়ে আছে এক ভালুক!

বিহ্বল হ'য়ে ভাবছেন রাজপুত্র—কি করবেন তিনি। গাছে আছে ভালুক, আবার নীচে ওঁৎ পেতে আছে বাঘ। বাঘ তাঁকে খাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। তখন রাজকুমার ভাবলেন ঃ এই দুই শত্রুর মধ্যে আপাততঃ বাঘই ভীষণতর। কাজেই এর হাত থেকে আত্মরক্ষাই এখন প্রধান কর্তব্য—এই ভেবে তিনি গাছে থাকাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করলেন।

রাজকুমারের মনে হঠাৎ এক বুদ্ধি এল। তিনি ভাবলেন যে, ভালুক আর বাঘ উভয়ে উভয়ের শত্রু—অতএব নিজের স্বার্থে ভালুকের



...এগিয়ে আসছে
বিরাটাকার এক
বাঘ। (পৃষ্ঠা ২৬)

সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করা কর্তব্য। এই বিবেচনা ক'রে রাজকুমার আস্তে আস্তে ভালুকের গায়ে হাত দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে বললেন :

'বন্ধু, শত্রু নিকটে, এখন আর ঘুমিয়ো না, ওঠ।'

রাজপুত্রের ডাক শুনে ভালুক তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। নীচের দিকে তাকিয়েই সে দেখতে পেলো বিরাট সেই বাঘ। তখন ভালুক ভয়ে ভয়ে রাজপুত্রের পরিচয় জিজ্ঞেস করলো।

রাজপুত্র তাঁর নিজের পরিচয় দিলে ভালুক সন্তুষ্ট হ'লো, অনেকটা আশ্বস্তও হ'লো। তারপর ধর্ম সাক্ষী ক'রে রাজপুত্র আর ভালুক উভয়ে বন্ধুতা করলো। তারা প্রতিজ্ঞা করলো পরস্পর পরস্পরকে বিপদ্ থেকে আর শত্রু থেকে রক্ষা করবে।

তারপর ঠিক হ'ল দু'জনেই পালা ক'রে গাছের ডালে ঘুমোবে। রাজপুত্র অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে আছেন দেখে ভালুক প্রস্তাব করলো :

রাজপুত্র এখন ঘুমোবেন, আর ভালুক জেগে থেকে তাঁকে পাহারা দেবে। তারপর শেষ রাতে ভালুক রাজপুত্রকে ডেকে জাগিয়ে দেবে, তখন রাজপুত্র জেগে থেকে ভালুককে পাহারা দেবেন, আর ভালুক ঘুমোবে।

কথামত রাজকুমার একটা ডাল আশ্রয় ক'রে অতি সাবধানে শুয়ে পড়লেন। তারপর শীঘ্রই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলেন।

রাজকুমারকে ঘুমুতে দেখে বাঘ ভালুককে ভয় দেখিয়ে, অনুরোধ ক'রে নিজের স্বপক্ষে আনবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ভালুক নীতিধর্ম বিসর্জন দিয়ে রাজপুত্রের বিরোধিতা করতে রাজী হ'লো না। ভালুক বললো :

'ভীরুকে ভয় থেকে রক্ষা করা এবং শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়াই প্রত্যেকের কর্তব্য।'

ভালুকের কথা শুনে বাঘ ভীষণ তর্জন-গর্জন ক'রে তাকে শাসাতে লাগলো। সেই গর্জনে রাজপুত্রের ঘুম ভেঙে গেলো! ভালুক তাঁকে সান্ত্বনা দান ক'রে এবার নিজে ঘুমোবার উদ্যোগ করলো। রাজপুত্র জেগে পাহারা দিতে লাগলেন।

ভালুক যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'লো, তখন বাঘ রাজপুত্রকে লক্ষ্য ক'রে বললো ঃ

'রাজপুত্র, তুমি ঐ বেল্লিক ভালুকটাকে ঠেলে ফেলে দাও, আমি ওর রক্তমাংস আহার ক'রে পরিতৃপ্ত হ'য়ে চলে যাই—তুমি নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে বাড়ি ফিরে যাও। আমি তোমাকে অভয় দিচ্ছি তোমার কোন অনিষ্ট করবো না। আর যদি আমার কথা না শোন, তবে যখন তুমি গাছ থেকে নামবে তখনই আমি তোমার ঘাড় মট্‌কাবো।'

বাঘের কথা শুনে রাজপুত্র ভীষণ ভয় পেলেন। তিনি আর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রেই ভালুককে এক ধাক্কা দিয়ে গাছ থেকে ফেলে দিতে চাইলেন।

ভালুক পড়তে গিয়েও তার লম্বা লম্বা নখ দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ধ'রে বেঁচে গেলো। তারপর রাজপুত্রকে সম্বোধন ক'রে বললো ঃ

'তুমি চপলস্বভাব বালক, এখনও ভালো-মন্দ বোধ জাগেনি ; তাই তোমাকে ক্ষমা করলুম।'

এদিকে ভোর হয়ে এসেছে। রাজপুত্রের সঙ্গীগণ তাঁর খোঁজে

এদিকে আসছে। দূর থেকে তাদের কোলাহল এবং ঘোড়ার শব্দ শোনা গেল। সেই সাড়া পেয়ে বাঘ বনে ঢুকে পড়লো।

ভালুক তখন এক হাতে রাজপুত্রের ঝুঁটি ধরলো, আর এক হাতে সজোরে তাঁর গালে চাপড় দিতে লাগলো। স-সে-মি-রা—ভালুক একটা ক'রে অক্ষর বলে, আর একটা ক'রে চাপড় দেয়। তারপর সে গভীর অরণ্যে পালিয়ে গেল।

সঙ্গীরা এসে রাজপুত্রকে খুঁজে পেলো। কিন্তু রাজপুত্র তখন পাগল হ'য়ে গেছেন। তিনি কেবলি বলছেন 'স-সে-মি-রা'। তাঁর মুখে শুধু এই এক রব—'স-সে-মি-রা' কোনদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই, মুখে আর অন্য কোন কথা নেই।

সঙ্গীরা রাজকুমারকে রাজধানীতে নিয়ে গেলো। রাজা পুত্রের অবস্থা দেখে অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়লেন। তিনি রাজপুত্রকে যতই জিজ্ঞেস করেন :

'কি হয়েছে ?'

রাজপুত্র শুধুই বলেন :

'স-সে-মি-রা'।

রাজপুরীতে যত আত্মীয় ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, সবাই এলেন রাজপুত্রের মুখে স্বাভাবিক কথা ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু কারো চেষ্টাই সফল হ'লো না। রাজপুত্র কেবলি বলতে লাগলেন :

'স-সে-মি-রা'।

রাজা যখন দেখলেন, কিছুতেই রাজপুত্র সুস্থ এবং স্বাভাবিক হচ্ছেন না, তখন তিনি সমস্ত রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দিলেন :



…সজোরে তাঁর গালে
চাপড় দিতে লাগলো।
(পৃষ্ঠা ৩০)

'রাজপুত্রকে যে ভাল করতে পারবে, তাকে লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে।'

লক্ষ মুদ্রার লোভে কত দেশ থেকে কত বৈদ্য এলেন, চিকিৎসক এলেন, এলেন কত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি। কিন্তু কেউ আর রাজপুত্রের মুখে অন্য কোন কথা ফোটাতে পারলেন না। রাজপুত্রের রোগ কি, আর কেনই বা তিনি এমন করছেন—কেউ তার কোন হদিশ পেলো না।

রাজা নিরুপায় হ'য়ে মন্ত্রীকে ডেকে বললেন :

'মন্ত্রি, বিপদে আপদে তুমিই আমার পরিত্রাতা। এবারও তুমি যদি একটা ব্যবস্থা না কর, তবে আমারও আর বাঁচার আশা দেখি না। তুমি যাহোক একটা বিহিত কর।'

রাজার কাতরোক্তি শুনে মন্ত্রী তাঁকে সান্ত্বনা দান ক'রে বললেন :

'ভেবে দেখি কি হয়!'

মন্ত্রী বাড়ি চ'লে গেলেন।

পরদিন খুব ভোরে স্নান পুজো পাঠ ইত্যাদি শেষ ক'রে মন্ত্রী গেলেন রাজসভায়। সভাসদ্‌গণও সভায় উপস্থিত আছেন। সবাই ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করছিলেন মন্ত্রীর জন্যে—মন্ত্রী কি উত্তর দেন রাজাকে, তাই শুনবার জন্যে।

মন্ত্রী এসে বললেন :

"আমার বৌমা আমাকে জানিয়েছেন যে, মন্ত্রতন্ত্র কিংবা ওষুধপত্তর ছাড়াই শুধু কথার দ্বারা রাজকুমারের রোগ দূর করবেন।'

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজার আর তর সয় না। তিনি তখুনি পাঠালেন

মন্ত্রীকে, তাঁর বৌমাকে নিয়ে আসবার জন্যে। মন্ত্রীর বাড়িতে দোলা পাঠানো হ'লো।

রাজসভার একদিকে পর্দা টাঙানো হ'লো। পর্দার আড়ালে বসবেন মন্ত্রীর বধূমাতা—তিনি তো আর রাজসভায় প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত হ'তে পারেন না !

কিছুকাল পর মন্ত্রী তাঁর বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে রাজসভায় উপস্থিত হলেন। পর্দার আড়ালে বসলেন মন্ত্রীর বধূমাতা।

এবারে রাজা বসলেন রাজকুমারকে কাছে নিয়ে। রাজার পারিষদ্‌বর্গও যাঁর যাঁর আসন নিয়ে বসলেন।

পর্দার আড়াল থেকে শোনা গেল বধূর কণ্ঠ। তিনি মধুর ভাষায় বলতে লাগলেন বনের সব ঘটনা।

সভার সকলেই অবাক্ হ'য়ে শুনলেন বাঘ-ভালুক আর রাজকুমারের কাহিনী, শুনলেন রাজপুত্রের বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

রাজা জিজ্ঞেস করলেন রাজপুত্রকে ঃ

'সত্যি কি বনে এই ঘটনা ঘটেছিল ?'

রাজপুত্র উত্তর করলেন ঃ

'স-সে-মি-রা'।

রাজা কপালে করাঘাত করলেন। গল্প শুনেও তো রাজকুমার সুস্থ হলেন না। তবে বুঝি আর তাঁর রোগ সারবে না।

এবার পর্দার ওপার থেকে শোনা গেলো একটি শ্লোক ঃ

'সদ্ভাব বজায় রেখে যেই দেয় কোল।
তার সাথে বঞ্চনায় হয় গণ্ডগোল ॥'

অদ্ভুত ব্যাপার? এই শ্লোক শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুত্রের মুখের বুলি পালটে গেলো। এবার তিনি বলতে লাগলেন :

'সে-মি-রা, সে-মি-রা'।

এর পর শোনা গেলো আর একটি শ্লোক :

'সেতুবন্ধে সিন্ধুনীরে গঙ্গায় সাগরে।
ব্রহ্মঘাতী লভে মুক্তি, মিত্রদ্রোহী মরে॥'

শ্লোক শুনে রাজা তাকালেন পুত্রের মুখের দিকে। রাজপুত্রের বুলি আরও সংক্ষিপ্ত হ'লো। এবার তিনি বলতে লাগলেন :

'মি-রা, মি-রা'।

বিস্মিত হলেন রাজা, বিস্মিত হলেন সভাসদ্‌গণ—তাঁরা সব উৎকর্ণ হ'য়ে শুনলেন পরবর্তী শ্লোক :

'মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক।
যতদিন চন্দ্র সূর্য ভুগিবে নরক॥'

ফল ভালই দেখা গেলো। রাজপুত্রের বুলি থেকে আর একটি অক্ষর কমলো। এবার রাজপুত্র শুধু বলতে লাগলেন :

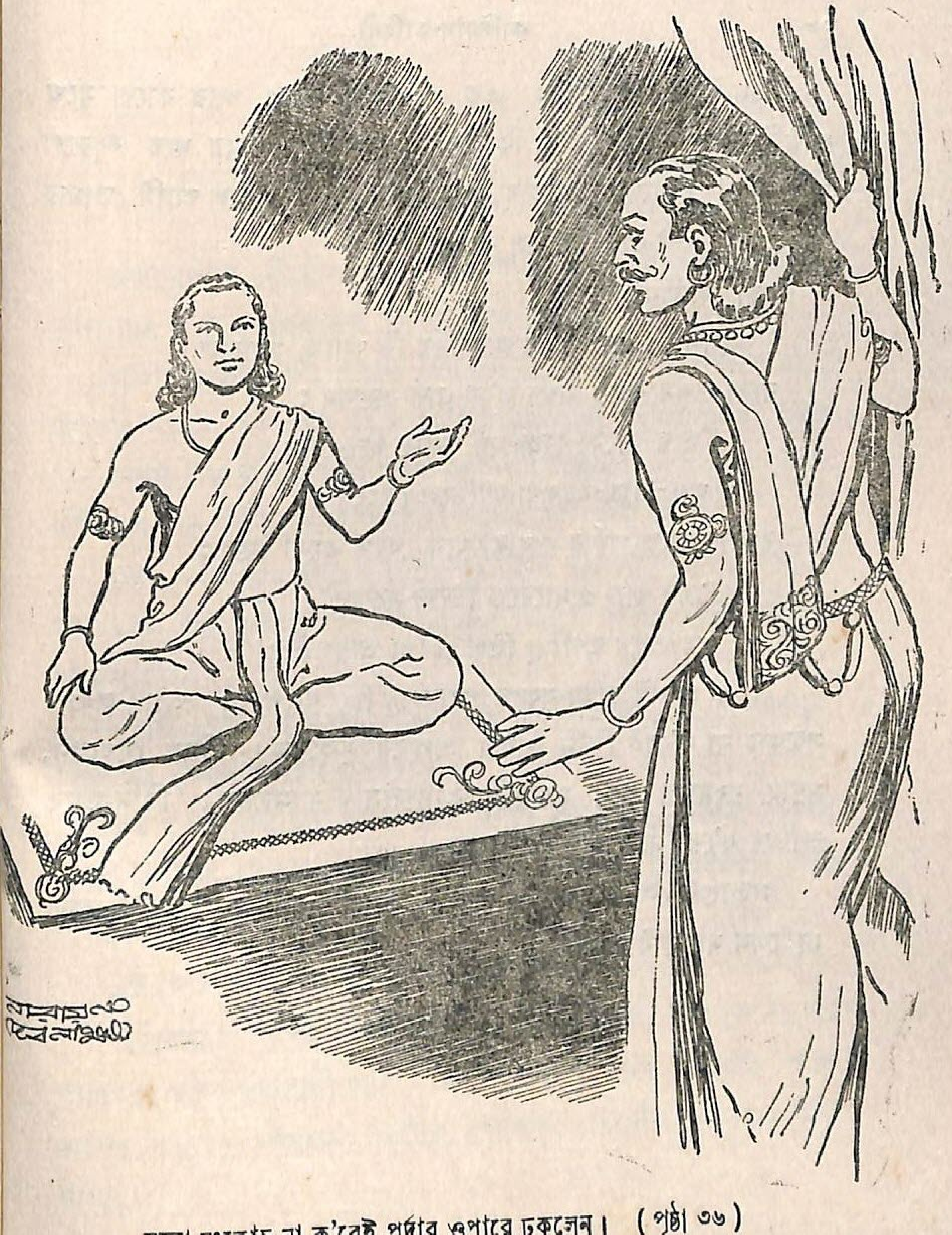
'রা, রা'।

অবশেষে উচ্চারিত হ'লো শেষ শ্লোক :

রাজা আর রাজপুত্র কল্যাণ ইচ্ছায়।
কাটাইবে কাল শুধু দানে ও পূজায়॥'

রাজপুত্রের মুখ থেকে 'স-সে-মি-রা' খ'সে গেলো। অবিলম্বে সুস্থ ও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠলেন রাজপুত্র। সভার সকলে বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেলেন।

রাজা বললেন মন্ত্রীকে :



লজ্জা-সংকোচ না ক'রেই পর্দার ওপারে ঢুকলেন। (পৃষ্ঠা ৩৬)

'এমন আশ্চর্য শ্লোক এক কালিদাস ছাড়া আর কারো মুখে শুনিনি কোন দিন ! ইনি কি সাক্ষাৎ সরস্বতী, তোমার ঘরে বধূরূপে আবির্ভূতা হয়েছেন, যাহোক্, মন্ত্রি, তুমি অনুমতি দিলে আমি তোমার বধূকে দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো ।'

মন্ত্রী বললেন ঃ

'বিলক্ষণ ! এতে আর আপত্তির কি আছে, মহারাজ !'

রাজা তখন বধূকে লক্ষ্য ক'রে প্রশ্ন করলেন ঃ

'ঘরে থাকো চারু-অঙ্গী নাহি যাও বনে ;
ঋক্ষ-ব্যাঘ্র-নরকথা জানিলে কেমনে ॥'

রাজার প্রশ্নে পর্দার ওপার থেকে ভেসে এলো উত্তর ঃ

'দেব গুরু প্রসাদেতে জিভে সরস্বতী ।
যে ভাবে জানিনু তিল কোথা ভানুমতী ॥'

একথা শুনেই রাজা বুঝতে পারলেন কি ব্যাপার। আর লজ্জা-সংকোচ না ক'রেই তিনি পর্দার ওপারে ঢুকলেন। গিয়ে দেখলেন, মন্ত্রীর বধূমাতা নয়, মহাকবি কালিদাস বসে আছেন। তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে নিয়ে এলেন সভাগৃহে।

সভাশুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য ক'রে উঠলো। রাজা জোড়হাতে ক্ষমা চাইলেন মহাকবির কাছে।

[৪]

রাজকুমারকে নীরোগ ক'রে দেবার পর রাজা কালিদাসকে আদর আপ্যায়ন ক'রে কথামত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করলেন।

কালিদাস মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ—অর্থে তাঁর কোন লোভ নেই। তাই উপহার পাওয়া সব অর্থই তিনি দানে ব্যয় করতে লাগলেন। আগে দান নেবার জন্য রাজবাড়িতে খুব লোকের ভিড় হ'তো। এখন তিনি এইভাবে দান করছেন ব'লে কয়দিন ধ'রে সেরূপ ভিড় হয় না।

রাজা প্রতিদিন যে শত সুবর্ণমুদ্রা দান করতেন, প্রার্থীর অভাবে তাও রাজা দান করবার সুযোগ পেলেন না। তাতে রাজা বিরক্ত হ'য়ে বললেন ঃ

'এখন থেকে তাহ'লে কালিদাসই দান-ধর্মাদি করুন, দরিদ্র-ভিক্ষুকের দুঃখদুর্দশা মোচন করুন!'

রাজার বিরক্তির কথা কালিদাসও শুনতে পেলেন! তিনি বুঝলেন —রুষ্ট নৃপতির কাছাকাছি থাকা সংগত নয়, অতএব কিছুদিনের জন্যে গা-ঢাকা দেওয়া উচিত।

এই ভেবে কালিদাস রাজার কাছে জানালেন ঃ

'মহারাজ! পুরুষ যদি দীর্ঘদিন একস্থানে থাকে, তবে সে কুয়োর ব্যাঙ-এর মতো স্বল্পজ্ঞানী হয়। এই কারণে দেশভ্রমণ পুরুষের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। অতএব আমিও ভেবেছি, কিছুদিনের জন্য বাইরে যাবো।'

রাজা বললেন ঃ

'বেশ, অল্পকাল আপনি ঘুরে ফিরে আসুন !'

কালিদাস, কোথায় যাবেন, ভাবতে গিয়ে ঠিক করলেন যে, রানী ভানুমতীর পিত্রালয়ে যাবেন।

ভানুমতীর পিতা ভোজরাজ বড় খেয়ালী মানুষ। তিনি ঘোষণা করেছেন, যে কেউ তাঁকে নতুন কবিতা শোনাতে পারবে, তাকেই তিনি চারি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন। ভোজরাজার সভায় আছেন কয়েকজন শ্রুতিধর পণ্ডিত। তাঁরা একবার কোন কিছু শুনলেই তা মুখস্থ ক'রে রাখতে পারতেন।

পুরস্কারের লোভে অনেক কবিই রাজসভায় এসে নতুন কবিতা পাঠ করেন। কিন্তু শ্রুতিধর পণ্ডিতগণ পরমুহূর্তেই আবার সেই কবিতা আবৃত্তি ক'রে বলেন যে, ঐ কবিতা বহু পুরোনো আর তা' অনেক কাল তাঁদের মুখস্থ আছে।

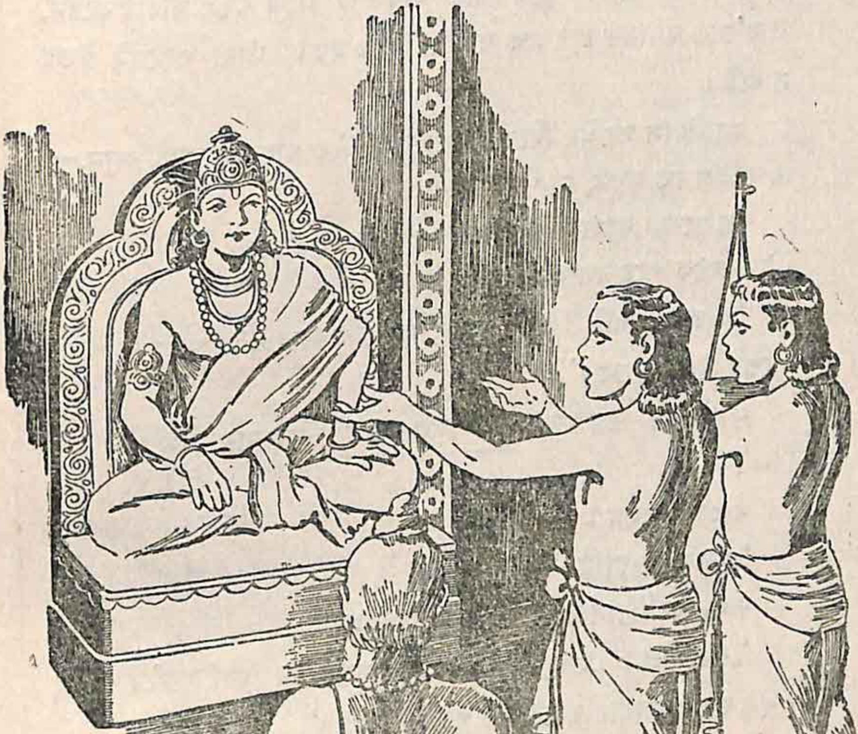
তার ফলে সকল কবিই এখান থেকে ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যান।

কালিদাস ভাবলেন : ভোজরাজের সভায় গিয়ে তিনি পণ্ডিতদের জব্দ ক'রে দান করবার জন্য অনেক অর্থ নিয়ে আসবেন।

এই ভেবে কালিদাস ভোজদেশে যাত্রা করলেন।

যথাসময়ে কালিদাস ভোজরাজের সভায় উপনীত হ'য়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। কবিতাটির অর্থ হ'লো : 'ভোজরাজের পিতা যজ্ঞদত্ত কালিদাসের কাছ থেকে অমুক সালের দশই বৈশাখ তারিখে আঠার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ধার নিয়েছেন। তাঁর পুত্র বড় হয়ে এই ধার শোধ করবেন। তাঁর সভায় অমুক অমুক পণ্ডিত এর সাক্ষী।'

রাজা এবং রাজসভার শ্রুতিধর পণ্ডিতগণ তো এ কবিতা শুনে একেবারে থ'। তাঁদের আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেলো। যদি কবিতাটি



...কালিদাস একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। (পৃষ্ঠা ৩৮)

ঘুরোনো ব'লে স্বীকার করেন, তবে রাজাকে আঠার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ধার শোধ করতে হয়। আর যদি কবিতাটি নতুন ব'লে স্বীকার করেন, তাহ'লেও কথামত চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিতে হয়। তাঁরা পড়লেন উভয় সংকটে।

কালিদাস তাগিদ দিতে লাগলেন : 'কোথায় মহারাজ, বলুন,—এ কবিতা কি নতুন, না পুরোনো !'

পণ্ডিতেরা কানাকানি করতে লাগলেন। রাজাও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পরে বললেন :

'আজ আপনি বিশ্রাম করুন, পরে বিবেচনা ক'রে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো।'

কালিদাস জানতে চাইলেন—এই বিবেচনার মেয়াদ কত দিন।

রাজা বললেন :

'মাত্র আজ রাত্রি।'

তখন কালিদাস রহস্য ক'রে বললেন :

'বেশ, তাই হোক্! তবে এই সাক্ষীদের আটক ক'রে রাখুন,—কি জানি আবার রাত্রে যদি পালিয়ে যায়।'

এই ব'লে কালিদাস বিশ্রাম করবার জন্য চ'লে গেলেন।

কালিদাস চলে গেলে পর, রাজা শ্রুতিধর পণ্ডিতদের নিয়ে সভা করতে বসলেন। রাজা অবাক্ হ'য়ে বললেন :

'আমি ভোজবাজির রাজা ব'লে জগদ্বিখ্যাত, আর এই ব্যক্তি এসে আমার উপর ভোজবাজি দেখিয়ে গেল! কি জানি, হয়তো আমার জামাতা বাবাজিরও এ ব্যাপারে কিছুটা যোগাযোগ

থাকতে পারে। যাহোক্, এ বিষয়ে আমার কি কর্তব্য আপনারা আমাকে উপদেশ দিন।'

সভাবিচক্ষণ নামে এক পণ্ডিত তখন রাজাকে এক গল্প শোনালেন :

"এক বনে ছিল ধূর্তশিরোমণি নামে এক শেয়াল। সেই বনে ছিল এক বাঘ আর বাঘিনী। বাঘ আর বাঘিনীর এঁটো কাঁটা যা কিছু প'ড়ে থাকে, শেয়াল তাই খেয়েই দিন কাটায়।

শেয়ালের মনে বড় লোভ—ওদের কাছ থেকে টাটকা তাজা মাংস কিছু খেতে পেলে হ'তো। তখন সে এক মতলব ঠিক করল। একদিন বাঘ শিকারের জন্যে গুহা থেকে বেরিয়ে গেছে—এমন সময় চারদিকে তাকাতে তাকাতে চুপি চুপি শেয়াল গেল বাঘিনীর কাছে।

মাটিতে চেপে ব'সে শেয়াল লেজ নাড়াতে নাড়াতে বাঘিনীকে ধমকে ধমকে বলতে লাগলো :

'ব্যাটা বেল্লিক বাঘ গেল কোথায়? আমার কাছ থেকে মাংস ধার নিয়েছিল, সে ধার কবে শোধ করবে সে। দেখি তোর ঘরে কি মাংস আছে, আজ সব নিয়ে যাবো তবে ছাড়বো।'

শেয়ালের ধমকে বাঘিনী গেল বেজায় ঘাবড়ে। সে আঁকু-পাঁকু ক'রে বললো :

'আপনি একটু অপেক্ষা করুন : আমি তো এসব কিছু জানিনে—কর্তা আসুক, তখন যা হবার হবে।'

এখন, বাঘের আসা পর্যন্ত শেয়াল যদি অপেক্ষা করে, তবে তার প্রাণ যাবে। কাজেই তাড়াহুড়ো ক'রে বিদায় হবার জন্যে সে আবার বললো :



'ব্যাটা বেল্লিক বাঘ গেল কোথায় ?'

(পৃষ্ঠা ৪১)

'স্বামী ঘরে না থাকলে গিন্নীকেই সব কিছু দেখাসাক্ষাৎ করতে হয়। যাহোক আমার আর আজ অপেক্ষা করবার সময় নেই। ঘরে যা কিছু মাংস আছে, নিয়ে আয়। আজ এই নিয়েই চ'লে যাই। হিসেবপত্র পরে যথাসময়ে করা যাবে'খন!'

বাঘিনীও ভাবলো : তাই ভালো ; যত শীঘ্র আপদ দূর করা যায়, ততই মঙ্গল!—এই ভেবে, ঘরে অল্পস্বল্প যা মাংস ছিল, তাই দিয়ে দিলো শেয়ালকে। শেয়ালও টাট্‌কা তাজা মাংস পেয়ে খুব খুশি হ'য়ে চ'লে গেলো।

বাঘ তার গুহায় ফিরে এলো রাত্তিরে। বাঘিনী তাকে সারাদিনের খবর জানালো, কিন্তু ভুলে গেলো শেয়ালের কথা বলতে!

পরদিন আবার বাঘ বেরিয়ে গেলে পরে শেয়াল এসে তম্বি করতে লাগলো। এদিনও বাঘিনী শেয়ালকে কিছু মাংস দিয়ে বিদায় করলো।

এই ভাবে দিনের পর দিন যায়—শেয়াল রোজই এসে মিথ্যে দেনার কথা ব'লে বাঘিনীর কাছ থেকে মাংস নিয়ে যায়। বাঘের কাছে শেয়ালের কথা বলতে বাঘিনীর কোনদিনই আর মনে থাকে না।

হঠাৎ বাঘিনীর একদিন মনে হ'লো শেয়ালের কথা। তখন সে বাঘকে শেয়ালের কথা জানালো। শুনে তো বাঘ চটে অস্থির। সে বাঘিনীকে বললো :

'তুমি একবার চোখ পাকালেই দেখতে শেয়াল কোথায় পালিয়ে যায়। তা' না ক'রে ভয়েই অস্থির। এত ভীতু হ'লে কি সংসার চলে!'

বাঘের কথায় বাঘিনীর অভিমান হ'লো। তার চোখ থেকে জলের ধারা বইতে লাগলো।

বাঘ এবার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো ঃ

'ঠিক আছে! তুমি আমাকে দেখিয়ে দেবে ঐ ব্যাটাকে—আমি ওকে শায়েস্তা করবো।'

বাঘিনী শান্ত হ'য়ে এবার বললো ঃ

'আচ্ছা! কাল তুমি বনে না গিয়ে ঐ বড় গাছটার আড়ালে থেকো! তারপর যখন শেয়াল আসবে, তখন যা করবার তাই ক'রো।'

পরদিন বাঘ আর বনে গেলো না—সে তার গুহার কাছে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলো।

তারপর যথাসময়ে অন্য দিনের মতই শেয়াল এলো চারদিকে তাকাতে তাকাতে। যখন বাঘকে ধারে কাছে সে দেখতে পেলো না, তখনই সে গুহার কাছে এসে মাটিতে লেজ আছড়াতে আছড়াতে হাঁক ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ

'ব্যাটা বেল্লিক বাঘ কোথায় গেলো, ও কি আমার ধার শোধ করবে না?'

বাঘ শুনতে পেলো শেয়ালের ঐ আস্ফালন। সে বেরিয়ে এলো গাছের আড়াল থেকে।

বাঘিনী শেয়ালকে ডেকে বললো ঃ

'ওগো মহাজন, এই যে তোমার খাতক আসছে ঋণ শোধ করতে।'

বাঘের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়েই শেয়াল লেজ গুটিয়ে পড়ি তো মরি ক'রে দিল এক ছুট।

বাঘ বললো :

'ওরে ব্যাটা, আমার এঁটো কাঁটা খেয়ে তোর দিন চলে, আর তুই কিনা আমায় ভাঁড়িয়ে মহাজন সেজে বসেছিস। দাঁড়া, বার করছি তোর মহাজনি !'

এই না ব'লে, বাঘও শেয়ালের পিছু পিছু ধাওয়া করলো।

শেয়াল দৌড়ুতে দৌড়ুতে তার গর্তের কাছে এসে পড়লো। বাঘও তাকে ধ'রে ফেললো আর কি।

এখন, একটা বটগাছের নীচেই ছিল শেয়ালের গর্ত। আর গর্তের মুখের কাছেই ছিল পাশাপাশি দু'টো বটের শিকড়। শেয়ালের ছোট্ট দেহখানা শিকড় দু'টোর মাঝখান দিয়ে অনায়াসে গ'লে বেরিয়ে যেতো।

শেয়াল দৌড়ুতে দৌড়ুতে শিকড়ের মাঝখান দিয়ে একেবারে গর্তে ঢুকে গেলো।

পিছু পিছু ছুটে আসছে বাঘ। শেয়ালকে গর্তে ঢুকতে দেখে সেও শিকড়ের মাঝখান দিয়ে গর্তে ঢুকতে চাইলো।

কিন্তু বাঘের এই বিরাট দেহ শিকড়ের মাঝখান দিয়ে গলবে কেন ? কোনরকমে মাথাটা ঢুকে গলা আটকে গেলো শিকড়ের মাঝে।

বাঘ আর এগুতেও পারছে না আবার পিছনেও হটতে পারছে না। তার গলায় ফাঁস লেগে গেলো। গলা দিয়ে কতক্ষণ ঘর্ ঘর্ ক'রে আওয়াজ বেরুলো। বাঘের গর্জন শুনে শেয়াল ভয়ে দু'চোখ বন্ধ ক'রে প'ড়ে রইলো মড়ার মত।

খানিক বাদে বাঘের গর্জন গেলো থেমে—শিকড়ের ফাঁসেই বাঘের মরণ ঘটলো।

অনেকক্ষণ আর বাঘের গর্জন শুনতে না পেয়ে শেয়াল ভাবলো, বাঘ ব্যাটা কি তবে চ'লে গেছে !

সে আস্তে আস্তে এসে গর্তের বাইরে উঁকি দিলো। দেখলো, গর্তের মুখেই প'ড়ে আছে বাঘ। সে ভাবলো, বাঘটা বুঝি ওখানে ঘুমিয়ে আছে। ভয়ে শেয়াল আবার গর্তে ঢুকলো।

কিন্তু বাঘের তবু আর কোন সাড়াশব্দ নেই। শেয়ালের মনে সন্দেহ জাগলো, সে ভাবলো ঃ বাঘ যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে তো নাক ডাকবে, কিন্তু তাও তো শুনতে পাচ্ছিনে। আবার একটু এগিয়ে এলো শেয়াল। এবার সমস্ত লক্ষণ দেখে বুঝলো যে শিকড়ের ফাঁসে ব্যাটা বাঘ অক্কা পেয়েছে।

শেয়ালের মুখে হাসি আর ধরে না। সে দৌড়ে গেলো বাঘিনীর কাছে—তারপর তাকে ডেকে বললো ঃ

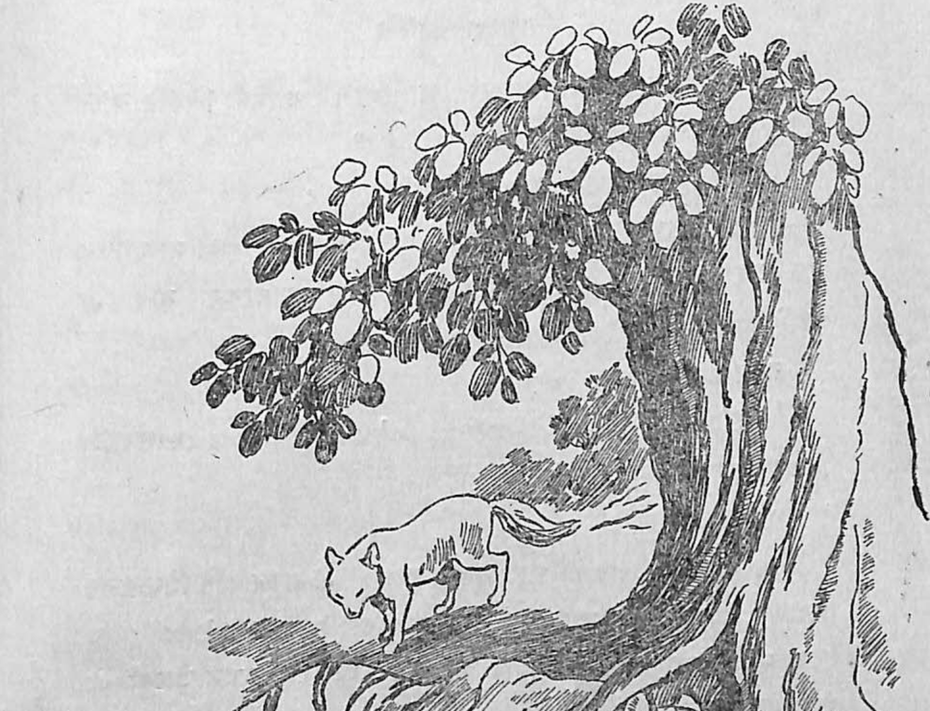
'কেমন রে, তোর কর্তাকে তো পাঠিয়েছিলি আমার পেছনে। এখন আয়, দেখে যা, ব্যাটা বেল্লিকের অবস্থা। ঘাড় মটকে একেবারে খতম ক'রে রেখে দিয়েছি আমার দরজায়।'

দৌড়ে এলো বাঘিনী। শেয়ালের গর্তের সামনে ম'রে প'ড়ে আছে বাঘ—দেখেই তো বাঘিনী হাউমাউ ক'রে কান্না শুরু ক'রে দিলো।

শেয়াল তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো ঃ

'আর কেঁদে কেটে কী হবে ! যা তোর কপালে ছিল তাই হয়েছে। এখন আয়, আমার সঙ্গেই ঘরকন্না করবি, আমিই তোর দেখাশোনা করবো।'

বাঘিনী ভয়ে আর আপত্তি করতে পারলো না। তারপর থেকে



…ব্যাটা বাঘ অক্কা পেয়েছে (পৃষ্ঠা ৪৬)

সে শিয়ালের সঙ্গেই বাস করতে লাগলো। বাঘিনী শিকার ক'রে আনে, আর শিয়াল পরমানন্দে দিন কাটায়।"

এ অবধি ব'লে সভাবিচক্ষণ রাজাকে বললেন ঃ

'তাহ'লে দেখুন মহারাজ, মিথ্যা ঋণের অপবাদেও কী সাংঘাতিক ফল হ'তে পারে! কাজেই ঋণের অপবাদ রাখবেন না। ঐ ধূর্তশিরোমণির ঋণ স্বীকার করুন।'

রাজা মন-মরা হ'য়ে বললেন ঃ

'তাহ'লে কি ঐ কবিই ধূর্তামো ক'রে আমার ওপর ভোজবাজি দেখিয়ে যাবে!'

পণ্ডিত বললেন ঃ

'না মহারাজ, তারও উপায় করতে হবে। ঐ নতুন কবি মিথ্যাচরণ করেছেন, কাজেই তাঁর সঙ্গে যদি মিথ্যাচরণ করা যায়, তাহ'লেও দোষ হবে না।—কালিদাস আপনার জন্যে যে ফাঁদ পেতেছেন তাঁকেই ঐ ফাঁদে ফেলবো।'

তখন পরামর্শ ক'রে স্থির হ'লো যে রাজা কালিদাসের নিকট পিতার ঋণের কথাই স্বীকার করবেন।'

তারপর কি ভাবে কালিদাসকে ফাঁকি দিতে হবে—সেই সম্বন্ধে সমস্ত আলোচনা হ'লো।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা এবং পণ্ডিতগণ যথাসময়ে তৈরী হ'য়ে রাজসভায় আসন গ্রহণ করলেন।

খানিক পরেই কালিদাস এলেন রাজসভায়। তারপর তিনি পূর্বদিনের কবিতাটি আবার আবৃত্তি করলেন।

শ্রুতিধর পণ্ডিতেরাও সঙ্গে সঙ্গেই কবিতা পুনরায় আবৃত্তি ক'রে

বললেন যে—এই কবিতা কোনক্রমেই নতুন নয়। এ কবিতা অনেক পুরোনো। কালিদাস অপরের লেখা কবিতা নিজের নামে চালিয়ে কবিত্বখ্যাতি লাভ করতে চাইছেন।

তখন কালিদাস বললেন:

'আপনারা যখন এ কবিতার সাক্ষী তখন মহারাজ তাঁর পিতৃঋণ শোধ করবার জন্যে আমাকে আঠার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিতে ধর্মতঃ বাধ্য।'

শ্রুতিধর পণ্ডিতেরাও কালিদাসের কথা সমর্থন ক'রে বললেন:

'হ্যাঁ মহারাজ! উপযুক্ত পুত্র অবশ্যই পিতৃঋণ শোধ করবেন! মহারাজ, আপনি ঋণ শোধের ব্যবস্থা করুন।'

রাজা তখন তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেবের লেখা একখানি পত্র এনে কালিদাসের হাতে দিলেন। পত্রখানি প্রকৃতই ভোজরাজের পিতা যজ্ঞদত্তের লেখা ছিল। এতে লেখা ছিল:

'অয়নাংশমতে আষাঢ়-সংক্রান্তির মধ্যাহ্নকালে এই নারিকেল গাছের উপর আমি অনেক স্বর্ণ রাখলুম। আমার পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হলেই এই অর্থ গ্রহণ করবে—নইলে দিব্য রইলো।'

এই পত্রের মর্ম-অনুযায়ী ভোজরাজা অনেক পূর্বেই নারিকেল গাছের উপর অর্থ অনুসন্ধান করেছেন—কিন্তু কোন অর্থ সেখানে পাওয়া যায়নি। রাজা সেই কথা গোপন রাখলেন। পণ্ডিতদের পরামর্শে কালিদাসকে ঠকানোর জন্যে তাঁর হাতে এই পত্রখানি তুলে দেওয়া হ'লো।

রাজা বললেন: 'আপনি এই অর্থ উদ্ধার ক'রে আপনার পাওনা নিয়ে নিন।'

কালিদাস পত্রখানি প'ড়ে তার মূল অর্থ বুঝে নিলেন। তারপর রাজাকে বললেন :

'আপনি পিতার সৎপুত্র, কুলপ্রদীপ। আপনি আপনার উপযুক্ত কাজই করেছেন। আমি আপনার স্বর্গীয় পিতার নির্দেশমতই অর্থ গ্রহণ করবো। কিন্তু চিঠিতে অর্থের কোন পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। এতে ঋণের সব অর্থ আদায় হবে কিনা বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে।'

রাজাও রহস্য ক'রে বললেন :

'অর্থের পরিমাণ যদি আপনার ঋণ-অপেক্ষা বেশি হয় তবে আপনি সেই অতিরিক্ত অর্থ আমাকে ফিরিয়ে দেবেন।'

কালিদাস বললেন ঃ

'সাধু সাধু? অবশ্যই তাই তবে। কিন্তু যদি সেখানে আমার প্রাপ্য সমুদয় অর্থ পাওয়া না যায়, তবে নিশ্চয়ই বাকী টাকা দিতে আপনি বাধ্য থাকবেন।'

রাজা তাই স্বীকার করলেন।

কালিদাস চিন্তা করতে লাগলেন—অয়নাংশমতে আষাঢ়-সংক্রান্তির মধ্যাহ্নকালে নারিকেল বৃক্ষের ছায়া ঠিক তার গোড়ায় থাকে। ছায়ারূপে গাছের অগ্রভাগ তার মূলে থাকে—কাজেই গাছের গোড়াই খুঁড়ে দেখা দরকার।

এই ভেবে তিনি গাছের গোড়া খুঁড়ে গাছ উপড়ে ফেলে দিলেন। নীচে পাওয়া গেলো পাঁচটি তামার ঘড়া-বোঝাই স্বর্ণমুদ্রা।

কালিদাসের বুদ্ধি দেখে সকলেই অবাক হলেন, অপ্রস্তুত হলেন! তাঁরা কল্পনাই করতে পারেননি—গাছের নীচে প্রকৃতই ধন পোঁতা আছে, এবং কালিদাস সেই ধন পেয়ে যাবেন। কিন্তু এখন আর



...পাঁচটি তামার ঘড়া-বোঝাই স্বর্ণমুদ্রা। (পৃষ্ঠা ৫০)

কিছুই করবার নেই। কালিদাসকে ফাঁকি দিতে গিয়ে রাজা ভোজ নিজেই ফাঁকে পড়লেন !

পাঁচটি ঘড়ায় স্বর্ণমুদ্রা ছিল সব শুদ্ধ পাঁচ লক্ষ। আঠার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার এখন অনেক বাকী।

কালিদাস ভোজরাজকে লক্ষ্য ক'রে বললেন ঃ

'মহারাজ ! এখনও অনেক অর্থ আপনার ঋণ র'য়ে গেলো। তা' শোধ করবার উপায় কি বলুন !'

রাজা এবং তাঁর সভাপণ্ডিতগণ নীরব হ'য়ে রইলেন।

তখন কালিদাস আবার বললেন ঃ

'এতদিন ধ'রে বহু কবিকে ঠকিয়েছেন ; তার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ আপনার এই পাঁচ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গেলো। আমি আর অর্থ চাইনে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন যে, ভবিষ্যতে আর কখনও কাউকে ঠকাবেন না। যদি কোন কবি প্রকৃতই আপনাকে নূতন কবিতা শোনাতে পারেন, তবে তাঁকে কথামত অর্থ দান করলেই আপনি ঋণমুক্ত হ'তে পারবেন। নতুবা পাপের ফলভাগী হ'তে হবে।'

রাজা লজ্জায় আর মুখ তুলতে পারলেন না। মাথা নীচু করেই কালিদাসের কথায় সায় দিলেন।

এই ভাবে ভোজরাজকে উপযুক্ত শিক্ষা দান ক'রে কালিদাস আবার নিজের দেশে ফিরে এলেন।

অল্পকালের জন্য কালিদাস রাজসভা ত্যাগ করলেও রাজা বিক্রমাদিত্য কালিদাসের প্রতি আবার প্রসন্ন হ'য়ে উঠেছিলেন। কাজেই কালিদাস যখন ভোজরাজ্য থেকে ফিরে এলেন, তখন রাজা তাঁকে খুব সমাদরে গ্রহণ করলেন।

তারপর রাজা যখন শুনলেন যে, কালিদাস ভোজরাজকেও ঠকিয়ে এসেছেন, তখন তিনি খুব পুলকিত হলেন। তিনি খুঁটে খুঁটে সমস্ত ঘটনা শুনলেন; তারপর কালিদাসের অসাধারণ বুদ্ধি ও চাতুরীর কাহিনী শুনে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

কালিদাস নির্লোভ ব্রাহ্মণ। তিনি যে ভোজরাজকে ঠকিয়ে পাঁচ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এনেছিলেন, তা' কেবল তাঁকে শাস্তি দেবার জন্যেই, নিজের ব্যবহারের জন্যে নয়। তাই, তিনি এই স্বর্ণমুদ্রা নিজে ভোগ করলেন না। তিনি রাজার অনুমতি চাইলেন, এই ধন ব্রাহ্মণদের দান করবেন। রাজা খুব খুশী হলেন। পত্র-দ্বারা ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ ক'রে আনলেন রাজসভায়। কালিদাস তখন সমস্ত ধন ব্রাহ্মণদের দান ক'রে দিলেন।

কর্ণাট প্রদেশের রাজা নিজে খুব বিদ্বান্ ছিলেন, তেমনি বিদ্বান্‌দের খুব আদর করতেন। তিনি কারো পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেলে তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা এবং পুরস্কার দিতে কখনও দ্বিধা বোধ করতেন না।

বল্লন ছিলেন কর্ণাটরাজের সভাকবি। তিনি যত বড় কবি ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিল তাঁর ভড়ং। তিনি ভাবতেন: তাঁর চেয়ে বড় কবি বুঝি আর কেউ নেই। আর যে সব কবি তোষামোদ ক'রে বল্লনকে তুষ্ট করতে না পারতেন, তাঁরা রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারতেন না। আর রাজার দেখা না পেলে তাঁর হাত থেকে কোন পুরস্কার লাভও সম্ভব নয়!

কাজেই রাজার সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে চাইতেন তাঁরা নানাভাবে বল্লনকে তোষামোদ করতেন। এই সমস্ত কারণেও বল্লনের মনে খুব অহংকার হয়েছিলো।

ছোট ছোট কবিরা যখন রাজসভায় আসতে চাইতেন, তখন বল্লন কিন্তু অনায়াসে তাঁদের রাজসভায় প্রবেশ করবার সুযোগ দিতেন। আর সেখানে রাজার সামনে তাঁদের পরাজিত ক'রে বাহবা পেতেন বল্লন। আবার সেই কবিদেরও অল্পস্বল্প পুরস্কার দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।

যদি কোন বড় কবি রাজার দর্শন কামনা করতেন, তখনই বল্লনের মনে ঢুকতো ভয়। তিনি নানা প্রকারে চাতুরী ক'রে তাঁকে তাড়িয়ে দিতেন—রাজসভা পর্যন্ত আর ঢুকতে দিতেন না। কারণ, তাঁর মনে

তখন ভয় হ'তো, পাছে রাজার সামনে সেই কবি বল্লনকে পরাজিত ক'রে বসেন !

কর্ণাটরাজের দান করার কথা এবং তাঁর সভাকবি বল্লনের চাতুরীর কথা ক্রমে উজ্জয়িনীর রাজসভায় এসে পৌঁছলো ! কালিদাস ভাবলেন : কর্ণাটের রাজসভা থেকে ভালোমত একটা পুরস্কার লাভ করতে হবে—আর বল্লনের চাতুরীও ভাঙতে হবে।

কালিদাস কিছুদিনের জন্যে ছুটি চাইলেন। উজ্জয়িনীর রাজা তাতে রাজী হলেন। কারণ, কালিদাস যদি কর্ণাটরাজের সভাকবিকে পরাজিত করতে পারেন, তাহ'লে তা' উজ্জয়িনীরাজেরও আনন্দের কারণ হবে।

বররুচি বললেন, তিনিও যাবেন কালিদাসের সঙ্গে। শেষে কালিদাস আর বররুচি দু'জনেই চললেন কর্ণাটরাজ্যের দিকে।

কালিদাস হলেন কবি আর বররুচি সাজলের তাঁর ভৃত্য।

যথাকালে কালিদাস আর বররুচি গিয়ে পৌঁছুলেন কর্ণাটরাজ্যে। গিয়ে দেখা দিলেন তাঁরা রাজকবি বল্লনের সামনে।

এখন বল্লন তো পরীক্ষা না ক'রে তাঁকে রাজার সামনে উপস্থিত করতে পারেন না। কি জানি এঁর কবিত্ব-প্রতিভা যদি বল্লনের চেয়ে বেশি হ'য়ে যায়।

তাই এখানেও বল্লন চাইলেন কবির প্রতিভার পরিচয়।

কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠই শুধু নন, তিনি চতুরচূড়ামণিও বটেন। তাই চাতুরীতেই তিনি বল্লনকে পরাস্ত করবেন, ঠিক করলেন।

কালিদাস আবৃত্তি করলেন একটা কবিতা। সেই কবিতার অর্থ হ'লো :

'রাজা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোন, আর নগরে কুক্কুটগুলি চৈবে তুহি চৈবে তুহি করছে।'

অত্যন্ত সাধারণ এবং নিম্নস্তরের কবিতা। আবার এর মধ্যে ভুলও আছে। শব্দেও ভুল এবং মিলও ঠিক নেই।

কবিতা শুনে বল্লন ভাবলেন: এ ব্যাটা একেবারে নিরেট মূর্খ; কাজেই একে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে নিজের বাহাদুরি বেশ আচ্ছা করেই জাহির করা যাবে!

এই ভেবে তিনি কালিদাস আর তাঁর ভৃত্যকে নিয়ে চললেন রাজদর্শনে।

যেতে যেতে পথে তাঁরা দেখলেন একটা বৃষ। কালিদাসের সঙ্গে একটু রগড় করবার উদ্দেশ্যেই বল্লন তাঁকে বৃষের সম্বন্ধে একটা কবিতা রচনা করতে বললেন।

এবারও কালিদাস চাতুরী অবলম্বন করলেন! তিনি অত্যন্ত সাধারণ একটা কবিতা রচনা করলেন। কবিতার অর্থ হ'লো:

'গোরুর বাচ্চা বৃষ। মুখে সে ঘাস খায়; তার লেজ আছে এবং শিং-ও আছে।'

এমন একটি বাজে কবিতা শুনে বল্লনের মুখে হাসি আর ধরে না। ভাবলেন: এই নিরেট মূর্খকে রাজার কাছে নিয়ে হাজির করলে বেশ রগড় হবে।

কালিদাসের কবিতা দু'খানা টুকে রাখলেন কবি বল্লন।

তারপর তাঁরা এগিয়ে চললেন রাজসভার দিকে। রাজসভায় উপনীত হ'য়ে তিনি রাজার কাছে কবির পরিচয় দিয়ে বললেন:

'এই কবির লেখা দু'খানা উৎকৃষ্ট কবিতা আছে এই ভূর্জপত্রে। মহারাজ নিজে বিচার করুন।'



বৃষের সম্বন্ধে কবিতা রচনা করতে বললেন। (পৃষ্ঠা ৫৬)

এই ব'লে যে ভূর্জপাতায় কালিদাসের কবিতা ছ'খানা লিখে রেখেছিলেন, তা এগিয়ে দিলেন কর্ণাটরাজের হাতে।

রাজা বল্লনকে কবিতা ছ'টো পাঠ করতে বললেন। বল্লন যেমন কবিতা পড়তে উদ্যত হয়েছেন, অমনি কালিদাস তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আবৃত্তি করতে লাগলেন অন্য কবিতা। সেই কবিতার অর্থ হ'লো :

'হে রাজন্, স্বয়ং বাণী নৃত্য করছেন আপনার মুখে ; তা দেখে কমলা চঞ্চলা হ'য়ে উঠলেও আপনার গুণে আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছেন। লক্ষ্মীকে আবদ্ধ দেখে চন্দ্রতুল্য শুভ্র কীর্তি ভয় পেয়ে ছুটে চলেছেন সমুদ্র পার হ'য়ে—আজও তার গতি থামেনি।'

রাজা বিস্মিত হলেন এঁর পাণ্ডিত্য আর কবিত্বশক্তি দেখে। বল্লন কবির মুখ ভয়ে চুন হ'য়ে গেলো।

খুব খুশি হ'য়ে রাজা কালিদাসকে আর একখানা কবিতা রচনা করতে অনুরোধ করলেন।

মুখে মুখে কালিদাস রচনা করলেন আর একখানা কবিতা। কিন্তু শেষ চরণ রাখলেন তিনি অপূর্ণ। ভৃত্যবেশী বররুচি তখন সেই অপূর্ণ শ্লোক পূর্ণ করলেন।

সভাশুদ্ধ সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। কালিদাসের ভৃত্যও বল্লন কবির চেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বল্লনের মুখে আর কথা সরে না ; তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে এইভাবে রাজসভার মধ্যে অপদস্থ হবেন। যদি বুঝতে পারতেন, তবে কি আর কালিদাসকে সেধে নিয়ে আসতেন রাজসভায় !

যাহোক্ কর্ণাটরাজ কালিদাসের এবং বররুচির কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে অতিশয় খুশি হ'য়ে অনেক পুরস্কার দিলেন। কালিদাস এবং বররুচি মহানন্দে ফিরে এলেন উজ্জয়িনীতে।

প্রখর গ্রীষ্ম। আকাশ যেন অগ্নিবৃষ্টি করছে। রাজা চলছেন পালকিতে। ছয় বেহারা পালকি টানছে। তাদের শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে। একজন বেহারা ভালো করে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। রাজা বললেন, 'আর একজন বেহারা জোগাড় করো।'

কিন্তু গ্রামের নির্জন পথে বেহারা পাওয়া যাবে কী ক'রে? মহা মুশকিল।' শেষে আশার আলো দেখা গেল। দূরে গাছতলায় একটা লোক বসে আছে। লোকটার যা চেহারা তাতে মনে হয় এসব কাজ করার অভ্যাস হয়তো তার আছে।

বেহারাদের একজন লোকটার কাছে গিয়ে বলল, 'চট্‌পট্ উঠে পড়্ তো, পালকিতে একটু কাঁধ দিবি।'

লোকটা অম্লানবদনে উঠে এসে নির্দেশমতো কাঁধ লাগালো।

কিন্তু পালকিটা ঠিক সমান তালে চলছিল না। রাজা বুঝলেন লোকটার এ অভ্যাস নেই। তিনি সংস্কৃতে ঐ লোকটার উদ্দেশ্যে বললেন—

ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম স্কন্ধস্ত যদি বাধতি।

এটি ছন্দে-গাঁথা শ্লোকের প্রথম চরণ। রাজা বলতে চাইলেন, 'ওরে মূর্খ তোর কাঁধে যদি বেদনা বোধ করে থাকিস তা হলে একটু জিরিয়ে নে না।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। লোকটা পরিষ্কার সংস্কৃত ভাষায় উত্তর দিল—

ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে।

অর্থাৎ, আমার কাঁধে ততটা বেদনা বোধ করছি না যতটা করছি আপনার ঐ 'বাধতি' পদটির জন্যে।

ব্যাপারটা হল কি 'বাধতি' পদটায় ব্যাকরণের ভুল আছে, শুদ্ধ পদটি হবে 'বাধতে'। লোকটি রাজার ভুল ধরিয়ে দিলো। শুধু ভুল ধরানো নয়, যে ছন্দে রাজা শ্লোকার্ধ রচনা করেছিলেন সেই ছন্দেই লোকটি তিলার্ধ দেরি না করে দ্বিতীয় চরণ রচনা করল। এতে প্রমাণিত হল সাধারণ শ্রমিক মনে করে যাকে পালকি বইবার কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল, সে আসলে কবি।

রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। পালকি থেকে নেমে তিনি সবিনয়ে লোকটিকে বললেন, 'আপনি বিদ্বজ্জন। না জেনে আপনাকে পালকি বইবার কাজে নিয়োগ করেছি, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছুক।'

লোকটি উত্তর দিল, 'আমি কবি, নাম কালিদাস।'

রাজা সসম্ভ্রমে কালিদাসকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

সমাপ্ত

জনশিক্ষা গ্রন্থমালা

১। মহাভারতীয় গল্প
২। পুরাণের গল্প
৩। পল্লীগীতি কাব্য-কথা
৪। জাতকের গল্প
৫। উপনিষদের গল্প
৬। ভাগবতের গল্প
৭। ভারত নারী
৮। মঙ্গলকাব্যের কথা
৯। জ্ঞানে ও কর্ম্মে বাঙ্গালী
১০। সাহিত্যে বাঙ্গালী
১১। রামায়ণী কথা
১২। ধর্ম্মে বাঙ্গালী
১৩। দেশপ্রেমে ভারতবাসী
১৪। দেবী যুদ্ধের কাহিনী
১৫। ভক্ত-জীবন কাহিনী
১৬। মহাকবি বাল্মীকি
১৭। কালিদাস কাহিনী
১৮। বাইবেলের গল্প
১৯। কালিদাসের গল্প
২০। কুমারসম্ভব
২১। পৌরাণিক কাহিনী
২২। সেকালের রাজাদের গল্প
২৩। সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প
২৪। বত্রিশ পুতুলের গল্প
২৫। কল্কিপুরাণের গল্প
২৬। প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য
২৭। বিল্বমঙ্গল
২৮। কথাসরিৎ সাগরের গল্প
২৯। এঁদের ভুলো না
৩০। রূপ-সনাতন
৩১। অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর
৩২। সন্ত তুলসীদাস
৩৩। ভক্ত রুইদাস
৩৪। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের গল্প
৩৫। সাধু তুকারাম
৩৬। তৈলঙ্গ স্বামী
৩৭। লোকসাহিত্যের গল্প
৩৮। সাধক জীবন-কাহিনী
৩৯। ঠাকুর হরিদাস
৪০। রঘুবংশ

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড